সময়ের প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্য ও ব্রজেন্দ্র কুমার দে

তরুণ কুমার দে

নান্দীঃ

''অভিনয় পত্রিকার প্রথম বর্ষপূর্তি - উৎসবে অভিনয় পত্রিকা - নির্বাচিত ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের অপেশাদার শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীদের পুরস্কার বিতরণ করতে গিয়ে দেখি, পুরস্কৃত তালিকায় একটি নাম বাদ পড়েছে। সে নামটি আমার।''

না, আক্ষেপ করেননি পুরস্কার বিতরণকারী প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়। একথা বলেই গর্বের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন— ''গণনাট্য-পুরোধা বিজন ভট্টাচার্যের হাতে সম্মান দক্ষিণা দানের সৌভাগ্যও তো একটি পরম পুরস্কার — সেই পুরস্কার পেয়ে আমি ধন্য বোধ করছি।'' মানবতাবাদী প্রবীণ নাট্যকার কম্যুনিস্ট অনুজ নাট্যস্রষ্টার প্রতি এর চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও স্বীকৃতি জানাচ্ছেন — এমন নজির আমার অভিজ্ঞতা বা তথ্যভাণ্ডারে নেই।

১৯৭১ -এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রিডারশিপ বক্তৃতা দেবার সময়ে নাট্যকার মন্মথ রায় অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রকুমারের উপস্থিতিতে নাট্যকার মন্মথ রায় অনুজ পালাকার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। গোড়াতেই তিনি বলেছিলেন — ''আধুনিক যুগের আদ্যভাগে যাঁর শক্তিশালী লেখনী যাত্রাকে যুগোপযোগী সাজসজ্জায় সুসজ্জিত করে জয়যাত্রার অগ্রসর হলো, তিনি ব্রজেন্দ্রকুমার দে।'' তিনি বক্তৃতাতেই বলেছিলেন— ''ব্রজেন্দ্রকুমার ইতিমধ্যেই পালা সম্রাটরূপে কৃতার্থ হয়েছেন। যোগ্য পাত্রেই সম্মান অর্পিত হয়েছে সন্দেহ নেই।'' নাট্যকার মন্মথ রায় ছিলেন মূলত পেশাদার মঞ্চের নাট্যকার। পেশাদার মঞ্চের যাত্রার প্রতি অবজ্ঞা কিছুকাল আগে পর্যন্তও ছিল সুবিদিত। কিন্তু মন্মথ রায় অনুজ পালাকারকে গভীর প্রীতি ও সম্মান জানিয়েছিলেন। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তকে বাদ দিলে এও একটি বিরল ঘটনা।

শুনেছি নরওয়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হেনরিক ইবসেন নাকি বয়োকনিষ্ঠ সুইডেনের নাট্যকার অগষ্ট স্ট্রীণ্ডবার্গ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে স্ট্রঈণ্ডবার্গ ইবসেনের চেয়ে মহত্তর স্রষ্টা বলে পরিগণিত হবেন। বোধহয় মহান স্রষ্টারা অনুজ প্রতিভাকে সব সময়েই সস্নেহে বিজয়মুকুট পরিয়ে দেন। অন্তত নাট্যকার মন্মথ রায় সে পথেই হেঁটে ছিলেন। অগ্রজ গ্রীক নাট্যকার প্রতিযোগিতায় অনুজপ্রতিমের কাছে পরাজিত হয়ে দীর্ঘদিনের জন্য দেশত্যাগ করেছিলেন। ভারতীয় প্রবীণ নাট্যকার উদার হৃদয়ে অনুজদের প্রশস্তি করেছিলেন। ইতিহাসে ও ঘটনাও লিপিবদ্ধ থাকবে নিশ্চয়।

প্রশ্ন ঃ

বিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের মূল স্থপতি বিজন ভট্টাচার্য এবং যাত্রাপালার প্রধান স্রষ্টা ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র সৃষ্টির মধ্যে কি কোনো মিল ছিল? দুজনে কি সমান্তরাল পথ ধরে একই লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করেছিলেন? এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন।

দুজনেরই জন্ম পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলায়। ব্রজেন্দ্রকুমারের ১৯০৭ -এ, বিজন ভট্টাচার্যের ১৯১৭ -তে। বিজন ভট্টাচার্যের বাবা শিক্ষকতা করেছেন দুই বঙ্গে। পূর্ব বাংলায় তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষক, মা ছিলেন বিশিষ্ট পরিবারের মেয়ে। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর মামা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সাহচর্যেই কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছিলেন।

অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রকুমারের বাবা ছিলেন স্বল্প শিক্ষিত। কোলকাতায় তিনি সামান্য চাকরি করতেন। মা-ও সামান্য লেখাপড়া - জানতেন। ব্রজেন্দ্রকুমার বাল্যের শেষ থেকে প্রথম যৌবনকাল কোলকাতায় কাটালেও শিক্ষক নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিত্বের সাহচর্য পাননি।

বিজন ভট্টাচার্য প্রথম জীবনেই কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্যে এসেছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই গণনাট্য সংঘের সঙ্গে মতবিরোধ হলে বেরিয়ে এসেছিলেন সংঘ থেকে। এর পরে বছর তিনেক বোম্বাইয়ে চলচ্চিত্র জগতে কাজ করেছিলেন। তারপরে ফিরে এসে ১৯৫০ থেকে নাট্যকার অভিনেতা, নির্দেশকরূপে কাজ করে গেছেন আমৃত্যু।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে এম.এ.পাশ করে শিক্ষকতার জীবিকা বেছে নিয়েছিলেন। প্রধান শিক্ষকতা করেছিলেন দুই বঙ্গেই। ছাত্রাবস্থায় শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত যাত্রাপালা রচনার কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন সময় পর্যন্ত (১৯৪৪) তিনি সৌখিন থিয়েটার ও যাত্রায় অভিনয় করেছিলেন, নির্দেশনার দায়িত্বও পালন করেছিলেন। কিন্তু একাধিকবার অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো সময়েই পেশাদার যাত্রায় নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেন নি। এমন কি, কোনো অ্যামেচার যাত্রা দলেরও তিনি কমিটির সদস্য ছিলেন না।

বিজন ভট্টাচার্য সারাজীবনে খুব বেশি নাটক লেখেন নি। কিন্তু যেকটি নাটক লিখেছিলেন, প্রতিটিই এখনও প্রাসঙ্গিক এবং স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির এককালের সদস্য হবার জন্য তাঁর শহরের বুদ্ধিজীবিমহলে বিশেষ পরিচিতে ছিল। বুদ্ধিজীবিরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, এখনও তা অটুট রয়েছে। ফলে তাঁর রচনা এবং অবদান থিয়েটারের পত্রিকা অনেক আলোচনা করেছে এবং করছে। দেরীতে হলেও অ্যাকাডেমি তাঁকে নাট্যকাররূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাঁর সাক্ষাৎকার ও বক্তব্য নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকবার ফলে তাঁকে চেনবার, বোঝবার ও ব্যাখ্যা করবার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধে আছে। সব চেয়ে বড়ো কথা থিয়েটার জগৎ কোনো সময়েই তাঁর অবদানকে অস্বীকার করে নি।

পক্ষান্তরে ব্রজেন্দ্রকুমার লিখেছিলেন অনেক। তাঁর জনপ্রিয় পালার সংখ্যাও অনেক। সেই সব পালার অনেকগুলোরই প্রাসঙ্গিকতা এখনও আছে। তিনি কার্তিকপুরে (১৯৩৭-৪৪) থাকাকালীন কমুনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে এসেছিলেন। এ বঙ্গে এসে তিনি বুদ্ধিজীবি মহলের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেন নি। যাত্রা শিল্পী বা কলাকুশলী ও পালাকারেরা তাঁর সম্পর্কে খুব সামান্যই আলোচনা করেছিলেন। সেই সব আলোচনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বা বেপথু এবং কখনও কখনও অতি প্রশংসায় ভারাক্রান্ত। তাঁর সাক্ষাৎকার খুব কম পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। সরকারী কোনো স্বীকৃতিও তিনি পান নি। সব চেয়ে বড়ো কথা যাত্রাজগৎ তাঁর সম্পর্কে প্রায় উদাসীন। বর্তমানে তাঁর পালা অভিনয় করলেও পেশাদার যাত্রাসংস্থা ও সংগঠন সযত্নে তাঁর নামটি বাদ দিয়ে থাকে।

সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য যেটা, সেটা হচ্ছে বিজন ভট্টাচার্য অপেশদার নাটকের জগতে সারা জীবন কাজ করেছিলেন, ব্রজেন্দ্রকুমার মূলত ছিলেন পেশাদার যাত্রা পালাকার। যে কোনো পরীক্ষা বিজন ভট্টাচার্য যত সহজে করতে পেরেছিলেন, ব্রজেন্দ্রকুমার যে ঠিক

ততখানি লড়াই করে সেই নতুনত্ব আনতে পেরেছিলেন।

তবে শিক্ষকতায় যুক্ত থাকবার জন্য ব্রজেন্দ্রকুমার প্রথম জীবনের পরে নিদারুণ দারিদ্র থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছিলেন। বিজন ভট্টাচার্যের চিরসঙ্গী ছিল অনটন।

দুজনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মিল ছিল এক জায়গায় — দুজনেই বাস্তুচ্যুত হয়ে শূন্য হাতে এ বঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মিল আরও একটা জায়গাতেও ছিল। দুজনেরই লক্ষ্য ছিল আদর্শে অবিচল থেকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। ১৯৬৭ -র পরে মঞ্চে বহু নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা যাত্রায় এসেছিলেন। তাঁদের কয়েকজন যাত্রায় এসে প্রচুর অর্থোপার্জনও করেছিলেন। নানা প্রলোভন এলেও বিজন ভট্টাচার্য সে প্রলোভনের হাতছানিকে উপেক্ষা করেছিলেন। একবার যাত্রা দল তাঁর নাটক নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু যাত্রা দলের আগ্রহ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রকুমার পেশাদার যাত্রা দলের লেখক হলেও অশ্লীল পালা লেখবার জন্য বিপুল অংকের অর্থের প্রতিশ্রুতি এলেও তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন দৃঢ়তার সঙ্গে। পেশাদার জগতের মানুষ হলেও যাত্রা দলের, পালাকারেরও শিল্পীর কোনো বিচ্যুতিই তাঁর তীব্র সমালোচনার কশাঘাত থেকে রেহাই পায় নি।

দুজনের মধ্যে মূল পার্থক্য ঃ বিজন ভট্টাচার্য কম্যুনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, ব্রজেন্দ্রকুমার ছিলেন মানবতাবাদী। আর এইটাই দুজনের সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তফাৎ সৃষ্টি করেছিল।

সম্প্রতি

ভারতীয় নিয়মে রাজ্যশাসনের চারটি ধাপ – সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ। ওই ভেদনীতিই বৃটিশ প্রয়োগ করতে শুরু করেছিল মহাবিদ্রোহের পর থেকে। ওই বর্বর নীতিরই চরম প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৪৬ -এ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ জুড়েই অবস্থান করেছিল ওই লজ্জাকর চিত্র। সচেতন কোনো শিল্পী - সাহিত্যিকই সমাজকে অস্বীকার করেন না।। যে কোনো অব্যবস্থারই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে। বিশেষত পরাধীন ভারতে সচেতন স্রষ্টাদের চেতনায় প্রথমেই ধরা দিত সাম্রাজ্য তথা উপনিবেশবাদ এবং বিভেদের নিগূঢ় সম্পর্ক।

বিজন ভট্টাচার্য কম্যুনিষ্ট ছিলেন। তাঁর বোধ অবশ্যই অনেক উন্নত ছিল। তাই নানাভাবে তাঁর নাটকে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি ধরা পড়েছিল। ১৯৭০ -এর লাশ ঘুইর‍্যা যাউক একাংক নাটকটিতে নাট্যকারের চিন্তা প্রকাশিত হয়েছিল। গভীর জনতা নিয়ে তিনি অনেকগুলো প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন ওই নাটকে।

দাঙ্গার সময়ে জসিমুদ্দিন গুণ্ডা দলের সামনে নির্ভয়ে জানিয়েছিল, ''আমাগো মহল্লায় হিন্দু - মুললমানে কোনো বিরোধ নাই।'' এর একটু আগেই দাঙ্গায় নিজের মাথা ফাটিয়ে এসেছিল সে। তার মাথা ফেটেছিল দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে হিন্দু সুরেন ডাক্তারকে বাঁচাবার চেষ্টায়। এর পরেই আরও স্নিগ্ধতা নিয়ে এসেছিলেন নাট্যকার। সুরেন ডাক্তার নিজেই জসিমুদ্দিনের চিকিৎসা শুরু করেছিল। গুণ্ডারা ঘরে ঢুকে ডাক্তারবাবুকে আঘাত করতে উদ্যত হলে আলতাফ তাতে বাধা দিয়েছিল। আলতাফ গুণ্ডা ইয়াকুবের ছুরি কেড়ে নিয়েছিল।

নাটকের একেবারে গোড়ায় হৃদয় ডাক্তারকে তাঁর হিন্দু বন্ধুরা পার্ক স্ট্রীটের দিকে ওই রাত্রে যেতে নিষেধ করেছিল, —''কিন্তু রাত্তির করে আবারঐসব অঞ্চলে যাবেন, পুরো মুসলমান এলাকা।'' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন গুরুতর আহত কাসেম আলিকে নিয়ে এসেছিল। সেও ছিল দাঙ্গার শিকার। এটা পরিকল্পনা করেই নিয়ে আসা হয়েছিল। দাঙ্গাকারীদের যে কোনো ধর্ম নেই, সেটাই প্রমাণ করবার জন্য। আবার মানবধর্ম যে হিন্দু (ডাক্তার) ও মুসলমান (আলতাফ, জসিমুদ্দিন) —সবার মধ্যেই ক্রিয়াশীল তাও চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন এভাবে।

পাশাপাশিpeace committee -র নানু, আনসার, হালিম, অনল, বিকাশ, রজত- সবাই রাত জেগে পাড়ায় পাহারা দিচ্ছিল। দাঙ্গাকারীদের আক্রমণের মিথ্যে সন্দেহে সুরেন ডাক্তার অন্ধকারে ভুল করে নিজের ছেলে নানুকেই চরম আঘাত করে বসে। ছেলেকে মেরে ফেলবার অনুশোচনায় সুরেন ডাক্তারও আত্মহত্যা করে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে এই নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তাঁর উজানীর চর নাটিকায় দাঙ্গার দুই নেতা যোগেশ আর জামালের হাতেই ভুলবশত তাদের নিজের নিজের ছেলেরা মহিম আর করিম খুন হয়েছিল। দাঙ্গাবাজ লতিফ বিমানকে মারতে গিয়ে নিজের ছেলে জয়নালকে মেরে ফেলেছিল। এই নিরিখে দুজনের চিন্তা প্রায় একমুখী ছিল। সুরেন ডাক্তারের ভীতি তাকে আক্রমণাত্মক করে তুলেছিল। যোগেশ, জামাল ও লতিফের ঘৃণা তাদের হিংস্র দানবে পরিণত করেছিল, । চারজনেরই পরিণতিতে এসেছিল ছেলের মৃত্যু। দুজন স্রষ্টাই সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিবেশকেই তরুণ প্রজন্মের মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিলেন পরোক্ষে।

মনে রাখতে হবে, দুজনের কেউই কিন্তু হতাশ হয়নি। দাঙ্গার ভয়ানক পরিবেশেও সুরেন ডাক্তার পার্ক স্ট্রীটের মুসলমান পাড়ায় চিকিৎসা - পরিষেবা দিতে গেছে। আবার জসিমুদ্দিন ডাক্তারকে বাঁচাতে নিজের রক্ত ঝরিয়েছে। নাট্যকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক জীয়নকন্যাতে ভারতমাতার প্রতীক সর্পহত উলুপীকে বাঁচাবার জন্য রঘুপতি আর বদর আলি একসঙ্গে লড়াই করেছিল। নবান্নে দয়াল, বরকত, নিরঞ্জন একসঙ্গে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সামিল হয়েছিল। যদি বদল আলির সংলাপ দেখি তাহলেও এই সংঘবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যাবে ঃ

''আমরা যদি সকলে আজ নিজ নিজ শিক্ষামত মন্ত্রগুলা সব গলার মিল দিয়া আওড়াই, তখন এই বেমিলের ভিতর ভিতর একটা মিল হয় তো লাগতে পারে।''

নাট্যকার দেখিয়েছিলেন ওই মিলিত মন্ত্রের জোরেই মৃত উলুপী বেঁচে উঠেছিল। অর্থাৎ মিলনেই হতে পারত অখণ্ড ভারতের প্রগতি, উন্নতি – এটাই পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন তিনি। নবান্নের শেষে সে জন্যই ফকিরের মুখে গান ছিল, – ''হিন্দু- মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।''

ব্রজেন্দ্রকুমার লিখেছিলেন অনেক পালা। ফলে নানাভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বক্তব্য নিয়ে এসেছিলেন তাঁর পালায় জীবনের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। নাট্যকার যেখানে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, পালাকার সেখানে বিস্তৃত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী তিনি চরম দুঃসময়েও শুনিয়েছিলেন। ৪৬ -এর দাঙ্গায় নিজের প্রিয়জন বিয়োগব্যথা বুকে নিয়েও লিখেছিলেন 'শেষ সমাজ' পালা, যা পরবর্তীকালে 'বাঙালী' নামে অতি বিখ্যাত হয়েছে।

এই বিষয়টি ব্রজেন্দ্রকুমার নানা দিক থেকে নানাভাবে বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রথমতঃ দাঙ্গার সৃষ্টি কোথায় তা খুঁজেছিলেন 'ধরার দেবতা', 'উজানীর চর', স্নেহের জয়ের স্থানে স্থানে। উজানীর চরের শাসক পক্ষ থেকে গোপন হুকুম এসেছিল– ''ধর্মে আঘাত দাও। ...pollute the temple and the mosque, তারপর একজনের দোষ আর

একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দাও।...Patriotism -এর আদ্যশ্রাদ্ধ হবে।" ধরার দেবতার রাষ্ট্রশক্তির আদেশ ছিল– ''শিবের মাথা উড়িয়ে দিয়ে বিষ্ণুর ঘাড়ে চাপিয়ে দাও।" বন্দে মাতরমের মুণ্ডপাত হবে।" 'স্নেহের জয়ে' ব্যবসায়ী স্টোন দাঙ্গার পরিকল্পনা ছকেছিল–" হিন্দু-মুসলমান এক হইলে কখনও চলিবে না।"

দ্বিতীয়ত সব পক্ষেরই অন্ধ গোঁড়ামি তাঁর ব্যঙ্গের চাবুকে ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ধর্মের বলিতে নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণীর পূজোর প্রার্থনা ছিল, – ''ওঁ যাদবায় মাধবায়– মোছলমানের গুষ্ঠীনিপাত কর ঠাকুর–" ওই পালারই নিয়ম মেনে – চলা দৌলত উন্নেসার সংলাপ ছিল, –''মুসলমান হয়ে হিন্দু ঠাকুর দেবতার নাম শুনলেও মহাপাপ হয়" বিদ্রোহী নজরুল পালার ছিল Satire আরও তীব্র ঃ

নজরুল ।। পাঁঠার ছায়া আপনার গায়ে লাগে না?

বিষ্ণুশর্মা ।। পাঁঠা আর মুসলমান এক হল?

নজরুল ।। পাঁঠার চেয়েও কি আমি অধম।

এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণার ক্লেদ অন্য আঙ্গিকেও প্রকাশ করেছিলেন পালাকার। 'বাগদান' পালায় – ব্রজসুন্দর চরিত্রের সংলাপে আক্ষেপ ছিল, –''আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তার মাকে প্রণাম করতে যখন হাত বাড়ালুম, তিনি প্রণাম নিলেন না; বললেন –আমি না কি অস্পৃশ্য ক্রিশ্চিয়ান।"

ক্রিশ্চিয়ানের মানসিকতা আবার ঠিক বিপরীত, –''হিদেন হচ্ছে অমার্জিত লোক– হিন্দু মুসলমান এই সব আর কি?

ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব তথা পবিত্রতাও যে সযত্নে সাজানো কথা, তার প্রমাণও রেখেছিলেন পালাকার। 'ছিন্নতা'র পালায় হিন্দু শিবাজীর ফৌজ বেলবাড়ী দখল করলে হিন্দুনারীরা নির্যাতন এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করেছিল। আবার রাখীভাই পালার বাহাদুর শার বাহিনী চিতোরে প্রবেশ করলে রাজপুতনারীরা জহরব্রত পালন করেছিল ওই একই কারণে। দুদিনের সুলতান পালায় সুন্নী মুসলমানদের বিজয় মুহূর্তে শিয়া নারীরা আত্মহনন করেছিল চরম অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। তাঁর পালায় দেখা গিয়েছিল এই জাতীয় ঘটনা ঃ

১। মুসলমান লম্পট হিন্দু বিধবাকে অপহরণ করে (পালা - বাঙালী)।

২। হিন্দু অপহরণ করে বিবাহিতা মুসলমান নারীকে (পালা - রাজা দেবীদাস)।

৩। মুসলমান মুসলমানীকে অপহরণ করে (পালা - আঁধারের মুসাফির)।

৪। দুশ্চরিত্র হিন্দু দরিদ্র হিন্দু বিধবাকে অপহরণ করে (পালা - মেঘে ঢাকা রবি)

কেন পালাকার এই বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়, যখন বাঙালী পালায় নারীহরণকারী গুণ্ডা হিন্দু মেয়েকে খুঁজতে এসে মুসলমানীকেই ধরে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। তাকে তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় – ''তা কি জানি?" পালাকার বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, লম্পট নারী অপহারকে কোনো ধর্ম নেই, সব ধর্মের ছত্রছায়াতেই তা গা ঢাকা দিতে পারে।

পালাকার নানা পালায় দেখিয়েছিলেন, প্রবল হিন্দুর দুর্বল মুসলমানের রাজ্য দখলের প্রয়াস (পালা - কোহিনূর)। আবার প্রবল হিন্দু শিবাজী ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য বেলবাড়ী দখল করে নিচ্ছে – এও তাঁর পালা (ছিন্নতার)য় চিত্রিত হয়েছিল। মুসলমান বাদশা আকবর মুসলমান রাজ্য আমেদনগর, পালা (চাঁদমারি) ঔরংজেব গোলকুণ্ডা (পালা - দুদিনের সুলতান); মুসলমান নবাব সোলেমান হিন্দু জায়গীরদার দেবীদাসে (পালা - রাজা দেবীদাস)র ক্ষুদ্র রাজ্যে হানা দিচ্ছে –এ নিয়েও পালা বেঁধে ছিলেন তিনি। সাম্প্রদায়িকতা যে কতখানি ভয়ংকর হতে পারে, তার প্রমাণ ছিল রক্ততিলক পালায়। অসংখ্য গুণসম্পন্ন একটি মানুষ নিজের সম্প্রদায়ের ছাতায় তলায় সবাইকে নিয়ে আসবার জন্য শিশু হত্যা, নারীনির্যাতন, অন্য সম্প্রদায়ের দেবমূর্তি অপসারণ করেছিল এবং নাগরিকদের ওপর চরম বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল।

পালাকারের কোহিনূর পালায় শক্তিহীন বিপন্ন মুসলমান বাদশাকে দুর্ধর্ষ গোলাম কাদেরের হাত থেকে বাঁচাবর জন্য এগিয়ে এসেছিল মহাদজি সিন্ধিয়া। আবার বাহাদুর শাহের হাতথেকে চিতোর রক্ষা করতে বাদশা হুমায়ুন এগিয়ে এসেছিল। অপহৃত হিন্দু নারী ছবির উদ্ধারে জীবন বিপন্ন করেছিল মুসলমান মোবারক (বাঙালী) আর মুসলমানী সোফিয়ার অপহরণে জ্বলে উঠেছিলেন হিন্দুরানী সর্বজয়া ঃ সবাই বলে আমি রত্নগর্ভা। আজ আমি তার প্রমাণ চাই। এই ভুঁইফোঁড় আফগানকে বুঝিয়ে দাও যে ছাতকেরে মেয়ের গায়ে হাত তুললে মাথা দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।"

ব্রজেন্দ্রকুমার নানা পালায় নানাভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভালবাসার চিত্র এঁকেছিলেন। চাঁদবিবি পালায় হিন্দু - যমুনাবাঈ ছিল নন্দন সিংয়ের গর্ভধারিণী এবং আফজল খাঁর পালিকা মা। ধর্মের বলিতে বজ্রনারায়ণের মা মাতৃহীন ফরিদেরও মায়ের জায়গা নিয়ে নিয়েছিল। বর্গী এল দেশে পালায় মেহের আর দিবাকরের প্রেম তো দীর্ঘদিন ধরে যাত্রার আসর মাতিয়ে রেখেছিল। বিদ্রোহী নজরুল পালায় – নজরুল আর প্রমীলার বিয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটি সুন্দরভাবে এসেছিল। ভ্রাতৃত্ব ও ভগ্নীত্ব ফুটে উঠেছিল মোরার ও ছবি (বাঙালী), কাঞ্চন ও আলেয়া (চাঁদের মেয়ে) মোহনলাল ও মেহেরুন্নেসা (বর্গী এল দেশে) এবং নন্দন সিং ও পাপিয়া (চাঁদবিবি)র মধ্যে। ঝাঁসির রাণীর গোলাম ঘোষ খৃষ্টান মান্দারকে, সতীর ঘাটের মুশা খাঁ মলুয়াকে (চাঁদের মেয়ে) -তে কেদার রায় মুসলমানী আলেয়াকে পিতৃস্নেহ দিয়েছিলেন।

তাঁর পালায় একটা সুপরিচিত ঘটনা মাঝে মাঝে দেখা গেছে। 'পাহাড়ের চোখে জল' পালায় কালাপাহাড় হিন্দুর মন্দির ভাঙতে এলে রাজমিস্ত্রী; রুস্তম বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। দাধমায়রের দেশে পালায় পীরের দরগায় দেবার জন্য আপেল নষ্ট করলে অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছিল বজ্রধর। আর নারীর সম্ভ্রম হানির চেষ্টার পরিণামে নিজের ছেলেকে চরম শাস্তি দিয়েছিল দায়ুদ খাঁ (বাঙালী) ও মুশা খাঁ (সতীর ঘাট)। সোফিয়া অপহরণের দায়ে নিজের ছেলেকে বন্দী করেছিল রাজা দেবীদাস।

ধর্ম নিরপেক্ষ শাসককেও তিনি পালায় তুলে ধরেছিলেন। ধর্মের বলি পালার খঞ্জন মিশ্র ছিল গোঁড়া হিন্দু, যার ঘৃণা ও অত্যাচার মুসলমানদের ওপর প্রতিনিয়ত প্রকাশিত ও প্রকট হতো। ওই পালার মোড়ল আর ফকির ছিল হিন্দু বিদ্বেষী এবং সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি সৃষ্টির অন্যতম রূপকার। নিরপেক্ষ বিচারক ফরিদ খাঁ ফকিরকে বন্দী করে রাজধানীতে পাঠায় এবং মোড়ল ও খঞ্জনকে একসঙ্গে বেঁধে রাখার আদেশ দেয়। এমন কি, নারী নির্যাতনের অপরাধে ভাস্কর পণ্ডিত তার দুই সৈনিক মধুরাও আর আলিবাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।

কিন্তু এটা সত্য যে, ব্রজেন্দ্রকুমার সর্বধর্মসমন্বয় থেকে তাঁর পালাকে ধর্মনিরপেক্ষতায় উন্নীত করেছিলেন। তাঁর পালায় দেখা গিয়েছিল, ব্রাহ্মণরাজা দেবীদাস এসে মুসলামানী সোফিয়াকে বলেছিল, –''বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে মা, আগে একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াও, তারপর বলছি," 'ধর্মের বলি'তে কীর্তিনারায়ণ মর্দান খাঁর মুর্গীর মাংস চুরি করে খেয়ে রান্নার প্রশংসা করে। আর সত্যপীর হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই বাতিল করে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ - বিরোধী সংগ্রামে প্রাণ দেয়।

সেই সঙ্গে Satire -এর তীর ছুঁড়ে ছিলেন ধর্মান্ধদের (রামী - চণ্ডীদাস পালা) ঃ

''করালী'' সে যদি তিনদিন পূজোয় অভিনয় করে, চতুর্থ দিনে দেবী মন্দির ছেড়ে চলে যাবে।

দুমুর্খ ''কোথাও যাবে না। পাথরের ঠাকুরকে ছাতা পেটা করলেও মন্দিরেই থাকবে।''

ফর্ম

বাংলা নাটকের একটা ফর্ম ছিল। সেটা মূলত ইউরোপের অনুসারী। তাতে Climax অবশ্যই থাকত। Climax -এর দিকে আরোহনও থাকত। বিজন ভট্টাচার্য আগুন নাটিকাটি লিখেছিলেন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি ওই ফর্ম ভাঙতে এসেছেন। নাটিকাটির ঘটনা অতি সামান্য। খাদ্যাভাবের সময়ে তিনটি নিম্নবিত্ত (একটি চাষী, দ্বিতীয়টি শ্রমিক এবং তৃতীয়টি হকার) এবং একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্নচিন্তার প্রকাশ ছিল প্রথম দৃশ্য চারটিতে, আর শেষ দৃশ্যে ছিল আশা – নিরাশা, বাদ - প্রতিবাদ এবং সিভিক গার্ডের অকারণ অমানবিক অত্যাচার – শেষে সবাই চাল পাওয়ায় নাটিকাটি শেষ হয়েছিল। শেষ হবার সামান্য আগে হঠাৎই এক যুবকের পেটে আগুন জ্বলবার ঘোষণা এসেছিল। নিটোল গল্প ছিল না। ছিল না নায়ক বা নায়িকা। আসলে নাটিকাটির কেন্দ্রবিন্দু ছিল দুষ্প্রাপ্য খাদ্যশস্য। চালই ছিল নাটিকাটির নায়ক। এমন নাটিকা কি আগে হয়েছিল? মনে হয় না। পেশাদার মঞ্চের ঘটনার ঘনঘটা, নায়কের ঔজ্বল্য, villain-এর শয়তানি কোনোটাই এখানে ছিল না। করুণ রস জমাবার চেষ্টাও ছিল না। নেতা, ক্ষিরি ও মনোরমার সংলাপে সিভিক গার্ড মানুষদের টেনে আনছিল, মাঝে একবার একজনকে ঘুষি মারতেও গিয়েছিল, একজনকে চড়ও মেরেছিল। তবু সে প্রখর রৌদ্র রস বইতে দিতে পারে, এমন সংলাপ ছিল না। লাইনে, দাঁড়ানো মানুষেরা লাইন ভেঙে তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি করেছিল সিভিক গার্ড একজনকে ঘুষি মারতে গেলে। কিন্তু তাতেও বীররস প্রকাশ পায় নি। Anti climax সৃষ্টি করবার মতো হঠাৎ এক যুবক ''আগুন! আগুন!'' বলে চেঁচিয়ে উঠে অন্যস্তরে নিয়ে গিয়েছিল নাটিকাকে।

এই ফর্ম ভাঙা অনেকটাই পরবর্তীকালে অব্যহত রেখেছিলেন নাট্যকার। ট্রাজেডি নাটিকা জবানবন্দীতে অনাহারে করুণ রস থাকলেও সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল আগমনী আশার আভাস। নাতির মৃত্যুর পরে বৃদ্ধ পরাণ তার পরিবার নিয়ে - প্রতিবেশীদের সঙ্গে শহরে আসে। উদ্দেশ্য ভিক্ষে করে প্রাণ বাঁচাবে। অভাব পারস্পরিক প্রেম - প্রীতি - ভালবাসার বাঁধন আলগা করে দেয়। দীর্ঘদিন অনাহারের পরে পেটভরে খিচুড়ি খেয়ে মারা যায় পরানের আর এক নাতি। অন্য দিকে মাতৃসমা শাশুড়ীর সঙ্গে পুত্রবধূর অশালীন ঝগড়া হয়। হাহাকার যেখানে নাটককে পেশাদারি জমানোয় সাহায্য করতে পারত সেখানে অদ্ভুতভাবে নাট্যকার humour এনেছিলেন। শবদাহ যারা করতে এসেছিল, তারা নিরুত্তাপ স্বরে যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে বোঝা গিয়েছিল যে বাবার ছেলে বা দাদুর নাতি নয়, মৃত শিশুটি একটি লাশ মাত্র। অভাবে পুত্রবধু বিপথে চলে গিয়েছিল। সেখানেও করুণ বা বীররসের আধিক্য না ঘটিয়ে পরিমিতি বজায় রেখেছিলেন নাট্যকার। শেষ দৃশ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মৃত্যু হচ্ছে, এমন সময়ে তার সংলাপ সমস্ত ট্রাজিক রসকে তরল করে দিয়ে আশা জাগিয়ে তোলে। পরাণকে ঘিরে টুকরো টুকরো ঘটনা এনে সাজিয়েছিলেন নাটিকাটি। নায়ককে যদি বা চিনে নেওয়া যায়, - villainকে খুঁজে পাওয়া দায়। বস্তুত এ নাটিকায় villain যদি থাকে, তবে সে খাদ্যাভাব। আগুনের যন্ত্রণা এই নাটিকায় আরও প্রকট হয়েছিল।

যে নাটকের নামেই বিজন ভট্টাচার্যের পরিচয়, সেই নবান্নকেও যদি বা open chain নাটক বলা হয়, তাহলে ভুল হয় না। আসলে তখন পুরোনো আবর্ত থেকে মুক্তি জরুরী ছিল। আর তা সম্ভব ছিল পেশাদার মঞ্চের বাইরেই। নবান্ন যখন প্রথম অভিনীত হয়েছিল, তখন অভিনেতা - অভিনেত্রীরা কেউই তারকা হননি। তাঁদের কাছে, নাট্যকারের কাছে, নির্দেশকের কাছে নবান্নের বক্তব্যটাই ছিল মূল এবং একমাত্র লক্ষ্য। পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে নাট্যকার ওই সময়ের গণনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, –''মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেটা জনসাধারণের মনেও দুর্বার হয়ে উঠেছিল।'' বাস্তব যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে ওই নবান্ন নাটকের জনপ্রিয়তা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নবান্ন অন্য নাট্যকারদেরও প্রভাবিত করেছিল, করছিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর থিয়েটারে দুঃখীর ইমান নামিয়েছিলেন। সেই নাটকও কিন্তু চড়চড় করে Climax -এ ওঠেনি। নবান্ন নাটকের প্রথম অংক গ্রামে, শেষ অংকও সেখানে। মাঝের দুটি অংক শহরে। জবানবন্দীর নায়কের মতোই মানুষগুলো ভারত ছাড়া আন্দোলনে যোগ দেবার পরে পরেই বন্যার প্রকোপে পড়ে। পারিবারিক সুন্দর বন্ধন নষ্ট হয়, অনাহারে মৃত্যু এগিয়ে আসে, চাষের জমি মহাজন বলপ্রয়োগে দখল করে নিতে এগিয়ে আসে।

দ্বিতীয় অংকে শহরে এসে ''A dog's life'' মেনে নিতে হয় সকলকে। গ্রামের মহাজনের মতোই এক চাল - ব্যবসায়ীকে দেখা যায়। মহাজনের সঙ্গে ওই চাল ব্যবসায়ীর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আর তার ফলশ্রুতি ছিল নারীপাচারে। শেষ পর্যন্ত নারী পাচারকারীরা অবশ্য পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। এর পরের অংকে শহরে এদের স্বজনের মৃত্যু দেখতে হয়। তার পরেই এরা আবার গ্রামে ফিরে আসে।

শেষ অংকে গ্রামে এসে ফসল তোলা এবং তা রক্ষা করবার জন্য চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়। এর পরেই নবান্ন - উৎসবে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

না। নবান্নে কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল না। কাজেই সেই চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটকের পঞ্চসন্ধি বা ওই জাতীয় ব্যাকরণ মানবার সুযোগ বা আরও ভাল করে বললে, চেষ্টাও ছিল না। জবানবন্দীর মতোই এ নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষের সৃষ্টি করা মন্বন্তর। পরিচয় (হ্যাঁ, পরিচয়) পত্রিকায় এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, –''গত দুবছরের বাংলা দেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায় একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্য - রসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে।'' দেখা যাচ্ছে প্রগতিশীল পত্রিকার সমালোচকও গল্প খুঁজেছিলেন। সেটা পান নি বলে নাট্যকারকে খানিকটা নিন্দা করেই লিখেছিলেন, —''সেই প্রতিভার পরিচয় আজও পাওয়া যায়নি।'' কিন্তু সমালোচক এটা অস্বীকার করতে পারেন নি যে, বিজন ভট্টাচার্য 'রঙ্গমঞ্চে এক নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন।'' বিশিষ্ট নাট্যকর্মীদের মধ্যে যাঁরা নবান্নের ফর্মকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি নবান্নের উষাকালেই লিখেছিলেন, —''এদের কানুন তৈরি হবে পরে।'' নবান্ন প্রসঙ্গে এতো বছর পরেও তার জনপ্রিয়তা লক্ষ করে বলা যায় ফর্ম বড়ো নয় বড়ো বক্তব্য; ফর্ম যার প্রকাশে সহায়ক হয়। আর নিটোল গল্পে নবান্নকে আবৃত করলে গল্পটাই দর্শকের মনে থাকত, চাপা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকত বক্তব্যের। প্রায় প্রতিটি নাটকেই নাট্যকার এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন। সুতরাং বিজন ভট্টাচার্য বাংলা নাটকে নতুন রীতির অন্যতম স্থপতির স্বীকৃতি পাবার সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

বিজন ভট্টাচার্য এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, —''রাজনীতি মানুষের জন্য, রাজনীতির জন্য কোনো দেশে কোনো মানুষ জন্মায় না।'' তিনি বিশ্বাস করতেন নাটক রাজনীতি প্রচারের মাধ্যম। কিন্তু সেই নাটকও অবশ্যই মানুষের জন্য সৃষ্টি করতে হয়। আর নাট্যকারের নাটক রচনার পেছনে অর্থোপার্জনের তাগিদ অবশ্যই ছিল না। ফলে তাঁর সৃষ্টি প্রায় সাবলীল গতিতে লক্ষ্যভেদ করেছিল। সে দিক থেকে বিজন ভট্টাচার্য সম্ভবত দাসপ্রথা বিরোধী ক্রেডরিক ডগলাসের মন্তব্যের বাস্তব উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ঃ মানুষ যা তৈরি করতে থাকে, তাই মানুষে তৈরি করে।

এই নিরিখে বিজন ভট্টাচার্য ভাগ্যবান (!) ছিলেন। কারণ তিনি যে সব মানুষের পরিমণ্ডলে থেকে নাটক সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা

খুব সহজেই মান্ধাতার আমলের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতেন। অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রকুমার এ বিষয়ে ছিলেন ভয়ানক ভাবে ভাগ্যহীন (!) । পেশাদার যাত্রার পাশাপাশি চারণ সম্প্রাট মুকুন্দ দাস স্বদেশী যাত্রা সৃষ্টি করে সফল হলে, পেশাদার যাত্রায় পাঁচ-দশ ভাগ বাদ দিলে ব্রজেন্দ্র কুমারের ভাষায় ''পাষাণে কসম নাস্তি।'' সেই যাত্রার পরিবেশকে কাহিনি, নাটকের ফর্ম, সংলাপ, সঙ্গীতের ব্যবহার, ব্যাখ্যা — সব দিক থেকে আধুনিক করে আনা ছিল ব্রজেন্দ্রকুমারের হিমালয়ের চেয়েও ভারি কাজ।

তিনি যাত্রায় এসেই বুঝেছিলেন, হয় তাঁকে অবস্থার ক্রীতদাস হতে হবে নয়ত জীবনব্যাপী সংগ্রাম করতে হবে। তিনি দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছিলেন। প্রাপ্তির আশা কখনও করেননি। কোনো অশুভ প্রতিশ্রুতিকে গ্রাহ্য করেননি। ছিটকে যাবার ভয়ে নিজের পথ থেকে একটুও সরে যাননি। তাঁর কাছে যাত্রাপালা ছিল হাতিয়ার।

যাত্রাপালার ফর্ম তাঁর সুদীর্ঘ পালাকারজীবনে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। আর তিনিই ছিলেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই মুখ্য কারিগর। প্রথম জীবনে লিখেছিলেন 'চাঁদের মেয়ে' পালা। যাত্রায় সাধারণত নিয়ম ছিল ধর্মের জয় হবে, অধর্মের এবং অধার্মিকের পরাজয় হবে। ব্রজেন্দ্রকুমারের চাঁদের মেয়েতে উন্মত্ত হিন্দু - মুসলমান দুই সম্প্রদায় পরস্পরের দিকে যখন ধেয়ে যেত তখন আলেয়া নামে একটি চরিত্রের দীর্ঘ একটি সংলাপ বিদ্বেষ মুছে দিতে । সম্প্রীতির প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যেত দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে। দেবতা আবির্ভূত হয়ে কিংবা দেবতার ভক্ত এসে সমাধান করবার পরিবর্তে হিংস্রতা সরে গিয়ে মানবিকতার উন্মেষেই পালাটি শেষ হত। পালাটি চার চারটি যাত্রাদল অভিনয়ের অযোগ্য বলবার পরে সূর্যকুমার দত্তের আগ্রহে অভিনীত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। সেই সঙ্গে যাত্রাপালার রাঁধুনির মালমশলায় পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

ধীরে ধীরে পালার ফর্মে ঠাসবুনন নিয়ে এসেছিলেন তিনি। নাটকের পঞ্চসন্ধি বা অন্যান্য বিভাজন স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করতেন। বেশ কিছু পালা সফল হবার পরে পেশাদার যাত্রাজগৎ ওই ফর্মকেই গ্রহণ করেছিল। বাদ দিয়েছিলেন অপ্রয়োজনীয় গান। তাঁর পালায় গান এসেছিল সংলাপের পরিপূরকরূপে। এমন কি, গণের গানকেও পালার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করেছিলেন। হাস্যরসকে ঘন্টাখানের পালা হবার পরে relief দিতে আনতেন না তিনি। হাস্যরসকে পালার প্রধান প্রধান চরিত্রের সংলাপে জুড়ে দিতেন। হাস্যরস সম্পৃক্ত সংলাপ অমোঘ সত্য প্রকাশ করত। ধীরে ধীরে সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল রীতি। যাত্রা যাঁরা দেখেন বা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে বর্গী এল দেশের দিবাকর, চাঁদবিবির মুরাজ, সোনাইদীহির যাবদ, দেবতার গ্রামের চন্দ্রচূড় বা নটী বিনোদিনীর অমৃতলালদের কখনোই ছেঁটে ফেলা যাবে না। অমৃতলালের ''আমরা নিজেরাই যে মানুষের সমাজ থেকে দূরে সরে এসেছি'', যে নটী বিনোদিনী পালার মূল সুরকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে এতে তো কোনো দ্বিমত নেই। সোনাই দীঘির 'শ্যামনটবর, কুঞ্জে বুঝি এল না রাই, হার মেনেছে পঞ্চকার...'' গানটি ছিল সোনাইকে চুরি করে আনতে ভাবনা কাজীর পাঠানো লোকদের মার খেয়ে ফিরে আসার খবর পৌঁছনোর ঠিক আগে। এই গানটি বাদ দিলে পল্লীর সুর অনেকটাই নষ্ট হয়, —এ তো আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা।

এই ফর্ম যখন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তখন শুরু হয়েছিল ফর্ম ভাঙবার চিন্তা। ক্লাইম্যাক্স পালার তিন - চতুর্থাংশ হয়ে গেলে নিয়ে আসা বা শেষে নিয়ে আসার রীতিকে তখন তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে লেখা পালায় Climax কিছু ছিলই না। নটী বিনোদিনী পালায় কোন্‌টা Climax ? বিনোদিনী গুর্মুখের প্রস্তাবে রাজী হওয়ায়। না কি শ্রীরামকৃষ্ণের বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করায়? শ্রীরামকৃষ্ণকে অপমান করবার বা বকলমা দেবার দৃশ্য দুটির কোনো একটি কি Climax আনবার দাবিদার হতে পারে না? ওই পালার গঠন খানিকটা wavy বারবার ওঠা আর নামায় তৈরি। বিদ্রোহী নজরুল পালার নজরুলের অনশনের দৃশ্য, প্রমীলার নজরুলের কাছে চলে আসবার ঘটনা, বুলবুলের মৃত্যু — সবই যেন একই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর নিটোল ঘটনা তো ছিলই না। একজন মানুষের কৈশোর থেকে যৌবনের শেষ পর্যন্ত ধূমকেতুর মতো বিচরণ করার কাহিনি open chain-এর সূতো দিয়ে বাঁধা হয়েছিল।

এখানে আরও একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে ওই সময়ে যাত্রা কিন্তু ধ্রুপদী ট্রাজেডি পরিবেশনের যথাযথ স্থান ছিল না, মেলোড্রামাই ছিল যাত্রার একমাত্র উপকরণ। মেলোড্রামায় ইচ্ছাপূরণ করতে হত। কিন্তু ব্রজেন্দ্রকুমার সস্তা ইচ্ছাপূরণের পথে হাঁটেন নি। তাঁর মেলোড্রামায় দায়ুদ খাঁ মারা যায় ধর্মান্ধের অন্যায় অস্ত্রাঘাতে। ওই দুর্জনের শাস্তিও হয়। কিন্তু সেটা জোলো ইচ্ছাপূরণে পর্যবসিত হয় না। কারণ দুর্জনের শাস্তি হয় কর্তব্যপালন ও আনুগত্যের উর্ধে এমন এক জেনারেলের উঠে আসায়, যার চরিত্রের ওই সম্ভাবনা আগেই নিপুণভাবে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল।

ট্রাজেডির সম্ভাবনা ছিল, এমন পালাও তিনি এনেছিলেন। কিন্তু ধর্মের বলির ট্রাজেডির নায়ক ছিল villain মুর্শিদকুলি। তার প্রতিশোধস্পৃহাই মৃত্যু দিয়েছিল তার দুই ছেলে — করিদ আর বজ্রনারায়ণকে। কিন্তু আবার এও ঠিক যে তার সেই রাগেরও কারণ ছিল। প্রাণরক্ষার জন্য সে ধর্মত্যাগ করেছিল। এই অপরাধে (!) তার পরিবার তাকে ত্যাগ করেছিল। ওই আঘাতই তাকে হিংস্র করে তুলেছিল। কিন্তু তাহলেও সে ছিল ''a man who is highly renowned and prosperous, but one who is not pre-eminently virtuous and just, whose misfortune, howerer, is brought upon him not by vice and depravity , but by some error of judgement and frailty.'' অন্যদিকে সোনাইয়ের ট্রাজেডির মূলে ছিল সমাজ - ব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতাবান ও বিত্তবানের রিরংসা দরিদ্রের আশা - আকাঙ্খা প্রেম-ভালবাসা, সুখ-শান্তি—সব নষ্ট করেছিল ['ধর্মের বলি' আর 'সোনাই দীঘি'র রচনাকালের মধ্যে তফাৎ ছিল আট বছর।]

স্মৃতির বেদনা ঃ

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য পূর্ববঙ্গের সন্তান হলেও স্বাধীন পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন না। পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে-ও ছিলেন পূর্ববঙ্গেরই ভূমিপুত্র। তিনি ১৯৪৪ -এর ডিসেম্বরের শেষে কার্তিকপুর ছেড়ে চলে আসবার পরে আর কখনও ওই বঙ্গে ফিরে যেতে পারেননি। দুজনেই যে নস্টালজিয়ায় ভুগেছিলেন তার প্রমাণ রয়ে গেছে তাঁদের রচনায়।

গোত্রান্তর নাট্যকারের পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে লেখা নাটক। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে প্রথমে পূর্ব বঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়া, পরে শান্তি কলোনি ছেড়ে চলে আসা হরেন্দ্রের মেয়ে গৌরীর সংলাপে নাট্যকারের নস্টালজিয়া ধরা পড়েছিল ঃ

গৌরি ।। জোত জমি খামার বাড়ি — কিছুরই তো অভাব ছিল না।

কানাই ।। দেশের বাড়িতে

গৌরী ।। হ্যাঁ, সেইখানে তো আমরা রাজা।

পালাকারের নস্টালজিয়া প্রথম ধরা পড়েছিল 'ধরার দেবতা' পালার ভূমিকায়। ১৯৪৯ -এ প্রকাশিত ওই পালার রচনার সময়েই স্থির বুঝেছিলেন তিনি যে, আর কখনও জন্মস্থানে ফেরা হবে না। তবুও ভূমিকায় স্বাক্ষর করে ঠিকানা লিখেছিলেন ''গাঁ ঘর, ফরিদপুর... ।'' ওই সময়েরই রচনা 'কালীপুত' পালায় জন্মভূমি থেকে বহুদূরে বিক্রী হয়ে যাওয়া এক ক্রীতদাসীর সংলাপ ছিল, —''আলো, আলো,

মা লক্ষ্মীকে আহ্বান করার জন্য ধরণী আজ আবার আলোর সাজ পরেছে। আমাদের ঘরেও বছরে বছরে লক্ষ্মী আসদো। আজও সেই দীঘির জলে অসংখ্য তারা ফুটেছে। ওঃ! কবে যাবো— কবে যাব সেই দেশে?" স্পষ্ট বোঝা যায় ওই বঙ্গের কোজগরী লক্ষ্মীপূজোর স্মৃতিই পালাকারকে বিষণ্ণ করেছিল।

এই বেদনা কিন্তু ১৯৭০ -এও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর পালার গানে — ''পাড়ি দিতে পরাণ পাগল, / চোখে নামে অশ্রুবাদল,/ হায় রে মাঝে কঠিন বেড়া পথ খুঁজে না পাই। ...যে মাটিতে জন্ম নিলাম, সে মাটি আর দেয় না ঠাঁই।" (কাঁটার বাসর)

ছিন্নমূল হয়েছিলেন দুজনেই। নাট্যকার উদ্বাস্তুদের বেদনা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর নাটকের নায়িকা গৌরি বলেই ফেলেছিল— ''স্রোতের শেওলার মত এইখানে এই মাস, ঐখানে দুই মাস— যারে কয় একেরে গরীব দুঃখীর জীবন।" পালাকারের পালায় গোবর্ধন বর্ণনা করেছিল নিজের কষ্টের জীবন— ''সবাইকে নিয়ে জমি - জিরেৎ ফেলে পালিয়ে এসেছি। সব ইষ্টিশনে বসে আছে। আমি ভিক্ষে করে নিয়ে যাব, তবে তারা খেতে পাবে। বড় ছেলেটিকে ফাটকে পূরে রেখেছে, মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে। সঙ্গে টাকা পয়সা যা ছিল, সব কেড়ে নিয়েছে।" (পালা —কাঁটার বাসর)

পালাকার ওই আকুলতা উচ্চ-মধ্যবিত্তের মধ্যেও লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তাঁর পালার প্রতিষ্ঠিত অ্যাডভোকেট বিনয়কিশোর রায়ের বেদনার্ত স্বগতোক্তি ছিল, —''কোথায় গেল সে মাটির স্বর্গ পীরগঞ্জ গ্রাম? সেই দিগন্ত প্রসারিত ধানক্ষেতের ঢেউ খেলানো মায়া, সেই নদী, সেই বন, সেই কর্দমাক্ত পথ আজ দুদিন ধরে কেবলি আমায় ডাকছে।" (পালা—কাঁটার বাসর)

গোত্রান্তর

গোত্রান্তর কিন্তু নাট্যকারের ছিন্নমূলদের সমস্যার নাটক নয়। নাটকটির বক্তব্যের ব্যাপ্তি ছিল আরও প্রসারিত। নাটকে স্বচ্ছল শিক্ষক তথাকথিত ভদ্রলোক হরেন্দ্রের downword (!) mobility দেখিয়েছিলেন নাট্যকার। নাটকটিতে তথাকথিত ভদ্রলোকের দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে একীভূত হওয়া চিত্রিত হয়েছিল। নাট্যকার শ্লেষ করেননি। কিন্তু নাটক দেখিয়েছিল অনুদার কপট নির্মম ও অসচ্চরিত্র ভদ্রলোকের শ্রেণি থেকে বেরিয়ে এসে হরেন্দ্র উদার, নির্মল, দরদী ও সৎ তথাকথিত ছোটোলোকেদের একজন হয়ে যাচ্ছেন। Sociology হয়তো একে downward mobility আখ্যা দেবে। কিন্তু নাটকের দর্শক অবশ্যই একে উত্তরণ রূপে চিহ্নিত করেছে বা করছে।

নাট্যকার যুক্তিবাদী ছিলেন। তাই মেলোড্রামার রীতিতে গৌরীকে লম্পট ছোটবাবুর হাত থেকে উদ্ধার করবার পরেই কানাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে 'গোত্রান্তর' ঘটাননি। নিপুণভাবে ধাপে ধাপে এসেছিল কানাই - গৌরীর বিয়ের লগ্ন। দেশত্যাগ, এই বঙ্গের শান্তিকলোনী, কলকাতায় বাসাবাড়ির পরেই বাধ্য হয়ে হরেন্দ্র সপরিবারে উঠে এসেছিলেন বস্তির তাড়ি ঘরে। দেশত্যাগের পরে শান্তি কলোনীতে এসে হরেন্দ্র পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছিলেন। ওই ছিল তাঁর আয়ের একমাত্র পথ। কিন্তু নানা কারণে তাঁকে না জানিয়েই ভদ্রলোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের অন্য স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। দরিদ্র এবং নিজের শ্রেণির মানুষের অসহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় চলে আসবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আসবার সময়ে জনৈক ভদ্রলোক তাঁকে জানিয়ে দেন যে, ''দুই শ টাকা না দিলে এ ঘরের উপর" তাঁর ''কোন স্বত্বই থাকবে না"। অর্থাৎ হরেন্দ্র দ্বিতীয়বার ছিন্নমূল হন। কলকাতায় আসবার সামান্য পরে তার ভরসা ভাই কেশবের চাকরি চলে যায় এবং সে বাড়িওয়ালার উচ্ছেদ ঠেকাতে গিয়ে হাজতবাস করে। শিক্ষক হরেন্দ্র শিক্ষাদানে সুযোগ না পেয়ে ফেরিওয়ালা হয়ে যান। বাসাবাড়ি থেকে উচ্ছেদের পরে ভদ্রলোকেরা অনেকেই এগিয়ে আসে এবং বাড়িওয়ালার সমালোচনা করে। কিন্তু উকিল তার গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে হরেন্দ্রদের থাকতে দিতে রাজি হয় না। যুবকদের সংঘ অন্তত আটচল্লিশ ঘন্টার নোটিশ না দিয়ে মিটিং ডাকবার এবং মিটিং -এ সিদ্ধান্ত না হবার অসুবিধে দেখিয়ে ক্লাবঘরে এক রাত হরেন্দ্রদের আশ্রয় দিতে পারে না। অতঃপর ভদ্রলোকের পছন্দের বাসাবাড়ি থেকে বেরিয়ে হরেন্দ্র বস্তিবাসী হন। বস্তিবাসী হবার পরে হরেন্দ্রের জন্য স্কুল বানিয়ে দেয় শ্রমিকেরা। ভদ্রলোকদের বিপরীতে গিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় — ''বাচ্চারা ঠিক ঠিক ইস্কুলে যাচ্ছে কিনা, ঠিক পড়ছে কিনা" খোঁজ রাখবে। ভদ্রলোক বাড়িওয়ালা হরেন্দ্রের স্ত্রী আর মেয়ের উদ্দেশ্যে অশালীন ইঙ্গিত করে, —''কোথাকার মেয়েলোক সব ঘরে ঢুকিয়েছো?" বস্তির মালিক উচ্চবিত্ত ছোটবাবু আর তার সরকার ভুলিয়ে বা অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে গৌরীর সর্বনাশ করার চেষ্টা করে। গৌরিকে বাঁচায় ছোটলোক শ্রমিক কানাই। নাটকের শেষে ভদ্রলোকের লোভ আর ক্রোধের আগুনে পুড়ে ছাই হয় বস্তি। সেই বস্তি আবার গড়ে তুলতে শুরু করে ওই ছোটোলোক শ্রমিকেরা। এর মধ্যে হরেন্দ্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, তাঁর আপনজন ভদ্রলোকেরা নয়, ওই তথাকথিত ছোটলোক শ্রমিকেরা। হরেন্দ্র এর আগেই অবশ্য সংস্কার ঝেড়ে ফেলে গৌরীর সঙ্গে কানাইয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

হরেন্দ্রর এই পরিবর্তন নাট্যকার ইঙ্গিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন শ্রমিক বস্তিতে স্কুল শুরু সময়ের হরেন্দ্রের সংলাপে — ''আমরা বলব, ক'তে কারখানা, খ'তে ক্ষেতখামার, গ'তে গান্ধিরাজা, ঘ'তে ঘর ঘর ভাই, ঙ'তে উয়াং চুয়াং, চ'তে চল বাঢ় চল..." বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের গোড়াতেই শ্রমিক আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষত, কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে সংগঠিত শ্রমিকেরা তাঁদের চেতনার স্তর অনেক উঁচুতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কম্যুনিস্ট মনস্ক বিজন ভট্টাচার্য প্রকারান্তরে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বর্তমান শোষণ ও নিপীড়নের অবদান সাধারণ মানুষের দুঃখ - কষ্টকে তুলে ধরেছিলেন ওই নাটকে। সেই কষ্টকে জয় করবার জন্য কী করতে হবে তার পথ্য তিনি দেখিয়েছিলেন। পুড়ে যাওয়া বস্তি পুনর্গঠনের কাজে হাত লাগায় শ্রমিকেরা। আর তাদের উৎসাহ দেন শিক্ষক হরেন্দ্র — ''চুপচাপ খারাইয়া আছস হাত লাগাইতে পারস না তার? হাত চালাও, কাম কর উঠাও বস্তী।" শেণিচ্যুত ভদ্রলোক হরেন্দ্র নিজেই ওই শ্রমিক শ্রেণির একজন হয়ে যান সেই সময়ে।

ব্রজেন্দ্রকুমার ছিলেন মানবতাবাদী, কমুনিস্ট নন। ফলে তাঁর পালায় এ জাতীয় গোত্রান্তর আসবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁর পালা গাঁয়ের মেয়েতে জমিদার বা সামন্তরাজার মেয়ে রূপবতীর গোত্রান্তর হয়েছিল। রূপবতী প্রথমে জমিদারি পরিচালনার কাঠিন্য ও গাম্ভীর্য নিয়ে এসেছিল। কিন্তু নায়েব দরিদ্র মদনের সঙ্গে বিয়ে হবার পরে তাকে নবাবের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল জেলে কাঙ্গালিয়ার বাড়িতে তারই মেয়ে সেজে। সেখানে রূপবতী জেলের মেয়ের মতই ঘুঁটে দেয়। নিজের জন্মস্থানে ফিরে এসে রূপবতী মুসলমান মাঝির স্ত্রী দরিয়ার দেওয়া ফল সংকোচ না করে খেয়ে নেয়।

রূপবতীর উচ্চবর্ণের উচ্চবিত্ত ন বাবা নিজের সুবিধের জন্য বৃদ্ধ, অসংখ্য বেগমের মালিক, নবাব সরফরাজ খাঁর সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চায় — রূপবতীর অমতে জোর করে। তার সহায়তা করতে আসে রাজকর্মচারী উচ্চবর্ণের পীতাম্বর এবং রূপবতীর দাদা পুণ্ডরীক। অন্য দিকে নবাবের শাস্তির ভয় ঝেড়ে ফেলে রূপবতীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে আসে মাঝি চৈতা। রূপবতীকে আশ্রয় দিয়েছে বলে শাস্তি হতে পারে শুনে জেলে কাঙ্গালিয়া বলে,— ''ফাঁক পেলে আরও তাই করবো।" রূপবতীর মর্যাদা হানি করেছিল বলে কাঙ্গালিয়া নিজের ছেলেকেও খুন করেছিল।

কবিগুরুর 'সামান্য ক্ষতি' কবিতায় শুরু করে পালাকার একটি যাত্রাপালা লিখেছিলেন। সে পালার অহংকারী রানী করুণা ভিক্ষে করে পুড়িয়ে দেওয়া কুঁড়ে ঘর গড়ে দিতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে ভদ্রলোকের চেয়ে ছোটলোক, ধনীর চেয়ে দরিদ্র, উচ্চবর্ণের তুলনায় নিম্নবর্ণের মানুষ অনেক সরল, উদার এবং মহৎ। তাই আবার রানীর জায়গা ফিরে পেয়েও সে প্রত্যাখ্যান করে বলে, — ''নিয়তি ওদের যত মারে, মানুষ মারে তার দশগুণ।'' রানী সাধারণ মানুষের মধ্যেই মিশে যায়।

রানী করুণাময়ীর পরিবর্তন প্রসঙ্গে পালাকারকে প্রশ্ন করলে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব ঐতিহাসিক, তিনি চিনের বিখ্যাত নেতা চু তে-র প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছিলেন। চুতে আফিমের নেশা করতেন। তাঁর হারেমে ছিল অসংখ্য পত্নী ও উপপত্নী। কিন্তু উপলব্ধির উচ্চস্তরে উঠে তিনি নেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। হারেম থেকে সমস্ত নারীকে মুক্তি দিয়েছিলেন। পরে তিনি কম্যুনিস্ট চিনের উপ - প্রধানও হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রা আর কখনও প্রাচুর্যের আড়ম্বরে ফিরে যায়নি।

আর একটা ব্যাপার পালাকার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে নিয়ে এসেছিলেন। নবাব আর জমিদারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল প্রভেদ। ওই প্রভেদ থেকেই নবাবের মনে জন্ম নিয়েছিল লোভ - সুন্দরী যুবতী রূপবতীকে চাই। পাঠক মনে করুন, নটী বিনোদিনী পালার গুর্মুখ রায়কে। সম্পদের অধিকার বলেই সে বিনোদিনীকে চেয়েছিল এবং বিনোদিনীর অনিচ্ছাতেও তাকে রক্ষিতা হতে বাধ্য করেছিল। এখানেও কিন্তু ওই সম্পদের অধিকারী বলেই গুর্মুখ রায়ের মনে লোভের সঞ্চার হয়ে, তা জেদে পরিণত হয়েছিল।

প্রবল পক্ষ বা রাষ্ট্রশক্তি কিন্তু এভাবে যুগে যুগে মাথা নুইয়েছে বা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে। ১৮৮৬-র তরামের অনুষ্ঠানে পুলিশের গুলি ৬ জন শ্রমিককে নিহত এবং অসংখ্য মানুষকে আহত করেছিল। পরের দিনের প্রতিবাদ সভায় রাষ্ট্রশক্তিই হাঙ্গামা করে। অতঃপর সাতজন শ্রমিককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। চারজনের ফাঁসি হয়। একজনকে জেলের মধ্যেই হত্যা করা হয় বলে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু জনতার চাপে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বাকি দুজনকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় প্রায় সাত বছর বাদে। সম্ভবত পালাকার ইতিহাসের এই ঘটনা থেকে idea পেয়েছিলেন।

মন্বন্তর ঃ

মন্বন্তর নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সৃষ্টির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ। 'জবানবন্দী', 'আগুন', 'নবান্ন'—ওই মন্বন্তরকেই তুলে ধরেছিল। 'নবান্ন' সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে, তার অনেকগুলোতেই নবান্ন এবং আগুন ও জবানবন্দীর ত্রুটির দিকে আঙুল তুলে ধরা হয়েছে বা হচ্ছে। মুখ্যত যে সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর নেই বলে নাট্যকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, সেগুলো হল। ঃ

১। দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর কেন হয়েছিল ?

২। দরিদ্র মানুষ কেন ওই মন্বন্তরে প্রাণ ও মান হারিয়েছিল ?

৩। দুভিক্ষ কি প্রাকৃতিক কারণে হয়েছিল, না মানুষ তথা রাষ্ট্রশক্তি তা সৃষ্টি করেছিল?

নবান্ন কেন সৃষ্টি হয়েছিল, তার উত্তর বিজন ভট্টাচার্য নিজেই দিয়েছিলেন, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে— ''সেটা হলো দুঃসহ এক জীবন যন্ত্রণা। যে যন্ত্রণার কালকূট ফেনিয়ে উঠেছিল আমারই দেশের লক্ষ লক্ষ বাপ মা ভাই বোনের চোখ মুখে...'' অর্থাৎ নাট্যকার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন ওইসব 'মূঢ় ম্লান মূক' মুখের যন্ত্রণা। আর তারই ফলশ্রুতি ছিল ওই মহৎ নাটক—নবান্ন। কিন্তু শুধু ছবি তোলার কাজই যে তিনি করেননি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ওই নাটকে প্রাসঙ্গিক হয়ে আসে বিবৃতি— ''সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষপুটচ্ছায়ায় পুষ্ট স্বার্থান্বেষী পাইকার মহাজন আর কালোবাজারি মজুতদারের দল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে'' মিলেমিশে চরম খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে নিয়ে এসেছে মন্বন্তর।

নাট্যকার নাটকের ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে কালোবাজারি বা মুনাফালোভী শ্রেণিটিকে তুলে ধরেছিলেন। হারু দত্ত নামের একটি গ্রাম্য ধনী ও দুর্ভিক্ষের মধ্যেই সুযোগ খুঁজে বেড়ায় কেমন করে দরিদ্রতম চাষীর জমি নামে মাত্র দানে বা লাঠির জোরে দখল করে নেওয়া যায়। শহরে ওই জাতীয় আর এক দুর্জন কালীধন। তার কাজ ওই দুর্ভিক্ষের সুযোগে চালের কালোবাজারি করা, সাধারণ মানুষকে তার পথে না আনতে পারলে অপমান করা, তার আরও একটি বিশেষ গুণ — নারীদের ব্যবসা তথা নারীচালান করা। সে সোজাসুজি জানিয়ে দেয় যে, পুলিশ বা বিচারক তার কিছু করতে পারবে না। এখানে অবশ্যই নাট্যকারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল যে, ওই দুর্ভিক্ষের সুযোগে নানা জনের নানা অন্যায় কাজ রাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে এবং মদতেই ঘটেছে।

নাট্যকার 'জবানবন্দী' নাটকেও দেখিয়েছিলেন, গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় রাস্তায় প্রায় ভিক্ষুকের জীবনযাপন করতে করতে বৃদ্ধ পরাণের পুত্রবধু বেন্দার স্ত্রী বিপথে চলে যাচ্ছে। নবান্নের বৃদ্ধের যুবতী মেয়ে বিক্রি করা আর জবানবন্দীর সন্তানবতী বধূর অন্যপথে যাওয়া একসুত্রে বাঁধা ছিল। জবানবন্দীতে ধরা পড়েছিল মধুলোভী এক ভদ্রবেশী যুবক। নবান্নে কালীধন তার নারীসংগ্রাহক হারু আর চ্যালা রাজীব সমেত প্রকট হয়েছিল নারীর চরম অবমাননার জন্য।

একথা সত্য যে, নাট্যকার সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তিকে দুর্ভিক্ষ এবং তার ফলাফলের জন্য দায়ি করেননি কোনো সংলাপে। কিন্তু উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর তার নাটকে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। আর অস্পষ্টতা তাঁকে রাখতে হয়েছিল দলের নির্দেশে। দল যদি তাঁর কলম চেপে না ধরত, তাহলে তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তিকেও সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন। জবানবন্দীর পরাণের ''পরমেশ্বর'' কে ডেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়বার বিপরীতে বেন্দার সংলাপ ''ঐ সেই পরমেশ্বর আর এই এক ভদ্দরনোক, সর্বনাশ করে ছাড়লে একেবারে আমাদের'', সেই দিকেই দৃষ্টি নিয়ে যায়। রাজা ঈশ্বরের অবতার— প্রায় সব দেশেই, এক সময়ে এটাই বলা হত, মানতে বাধ্য করা হত। সুযোগ পেলে নিশ্চয় নাট্যকার ওই পরমেশ্বরকে ''শ্বেত দৈত্য'' রূপে হাজির করতেন। নবান্নের পরের রচনা জীয়নকন্যা পড়ে আমার তেমনই মনে হয়েছে।

নবান্ন লেখা হয়েছিল ১৯৪৩ -এ ঠিক দুর্ভিক্ষ তথা মন্বন্তর চলাকালীন। এর ঠিক আগেই অগষ্ট বিপ্লব শুরু হয়েছিল। বিজন ভট্টাচার্য পরে নবান্নের ভূমিকায় বলেছিলেন,—''দেশব্যাপী যখন প্রত্যক্ষ গণ - অভ্যুত্থান আরম্ভ হল, ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখবার শেষ প্রাণান্তিক চেষ্টায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'' নবান্নের শুরুতে বৃদ্ধা পঞ্চাননী মাতাঙ্গিনী হাজরার মতই ব্রিটিশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং নিহত হচ্ছে —এমনই দেখা যায়। কেউ কেউ যখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন মাতঙ্গিনী পঞ্চাননী তাদের বলেছিল,— ''আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সবই, তাই পেছু হঠছিস। পেছোস নি, এগিয়ে যা।'' গান্ধীজি তথা কংগ্রেস ডাক দিয়েছিল। কম্যুনিস্ট পার্টি সমর্থন করেনি। পরে কংগ্রেসও দায় নেয়নি। কিন্তু ইতিহাস বলে, নীচের তলায় মানুষ দল-মত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে ওই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিল। বিজন ভট্টাচার্য সেখানে পুরোপুরি দলের নির্দেশ মেনে চলেন নি। তাই আগষ্ট বিপ্লব তাঁর নাটকের প্রথম অংক জুড়ে বিধৃত হয়েছিল। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, —সর্বশক্তি নিয়ে ওই সংগ্রামে যোগ দেওয়া কম্যুনিস্টদেরও উচিত। ওই সময়ে জনযুদ্ধের শ্লোগান দিয়ে স্বাধীনতা

সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়ানোটা যে দেশবাসীর মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, তাও হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দলের নির্দেশ মেনে নাটকে ব্রিটিশবিরোধী কোনো সংলাপ বা ঘটনা না রেখে প্রথম অঙ্কটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন।

দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তরের চিত্র ব্রজেন্দ্রকুমারের নানা পালায় বারবার ফিরে ফিরে এসেছিল। ১৯৪৩ -এই তিনি লিখেছিলেন যাত্রাপালা 'আকালের দেশে'। পেশাদার যাত্রা আসরে সমাজিক পালা পরিবেশনের পরীক্ষার সেটাই ছিল সূত্রপাত। 'আকালের দেশে'র নায়ক পক্ষ ছিল অর্ধাহার ও অনাহার জর্জরিত চাষীরা। খাদ্যাভাবে চাষীর মৃত্যু আসবেই দেখিয়েছিলেন পালাকার। ওই চাষীর মৃত্যুর পরে তার প্রতিবেশি চাষি বলে, —''সারাজীবন ঠাকুরপূজো করেছিস না? ঠাকুর তার সুন্দর প্রতিদান দিয়েছে।...ওর সঙ্গে ওর ঠাকুরকেও চিতায় তুলে দিস।'' মজুতদারের নির্মমতাও প্রকাশিত হয়েছিল চাষীর সংলাপে, —''সাতটা শস্যের পাহাড়, তার থেকে একমুঠো চালও আমাদের দিলে না''।

কিন্তু অন্নাভাব আর অকালমৃত্যু দেখিয়েই পালাকার তৃপ্ত হননি। তাঁর পালায় ছিল চাষীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ তথা অসহযোগ। তার আগে চাষী ভূষণের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিল চাষীরা। পালার শেষে চাষীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। তাদের নেতা জনার্দন বলেছিল, ''আজ আমরা বিজয়ী, ... আমরাই দেশের মালিক...''।

পালাকার পালার ভূমিকায় লিখেছিলেন — ''নিরন্ন জনসাধারণের হাহাকারে শাসকের ঔদাসীন্য ৩৫ লক্ষ বাঙালীর মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে।'' পরে অবশ্য পালাকার জেনেছিলেন যে, দুর্ভিক্ষে মৃত্যু ঘটেছিল আরও অন্তত ১৫ লক্ষ মানুষের। 'আকালের দেশ' পালায় পালাকার দুর্ভিক্ষের জন্য সরাসরি, শাসক পক্ষকেই দায়ী করেছিলেন এবং তাদের অপসারণের দিকেই জনমত তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আকালের দেশের সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল না। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য যেখানে সবাই মিলে ''গাঁতার খাটবার'' সংকল্পে নিয়ে এসেছিলেন চাষীদের, সেখানে পালাকার রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতার পথ দেখিয়েছিলেন। তবে পালায় অঙ্কুর নামের একটি চরিত্র সব সময়েই সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলে। তাকে পালাকার দেখিয়েছিলেন রাষ্ট্রশক্তির থেকে বেরিয়ে আসা বিদ্রোহীরূপে। পালার ভূমিকায় পালাকার এও লিখেছিলেন, —''বানরী পাড়ায় জনৈক মুক্ত রাজবন্দী আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, নাটকের অঙ্কুর চরিত্রে আমি নেতাজীকে উদ্দেশ্য করিয়াছি কিনা। তাঁহাকে ও পাঠকবর্গকে আমি সবিনয়ে জানাইতেছি, নাটকের কোনো চরিত্রের সঙ্গে নেতাজীর কোনো সম্বন্ধ নাই।'' সেই সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টি বৃটিশের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা বর্জন করেছিল। কিন্তু পালাকার অবশ্যই চেয়েছিলেন যে, অন্যান্য দলের মতোই কম্যুনিস্ট পার্টিও ওই সময়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হোক। সেইসঙ্গে তাঁর এও হয়তো বিশ্বাস ছিল যে, কম্যুনিস্টরা যুক্ত হলে তাদের চাপে আন্দোলনে দোষ বা বিচ্যুতির সংশোধন হবে। অঙ্কুর ছিল সেই কম্যুনিস্ট পার্টির কল্পিত প্রতিনিধি।

মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষের চিত্র পালাকার অন্যান্য পালাতেও দেখিয়ে ছিলেন। মায়ের ডাক পালায় ঝাঁসির রানী বাহিনীর সৈনিকের সংলাপে আক্ষেপ ঝরে পড়েছিল, —''এত শস্য ছিল যে, গোটা বাংলার অধিবাসীরা তিন বছরেও তা নিঃশেষ করতে পারতো না। কিন্তু সদাশয় সরকার সবই কিনে নিয়েছে। কতক বিদেশে চালান দিয়েছে, আর যা আছে, সরকারী গুদামে পচে গলে যাচ্ছে।'' দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার করুণ ছবিও ধরা পড়েছিল তার সংলাপে, —''রাজপথে উচ্ছিষ্টের জন্য মানুষে আর পশুতে সমানভাবে কামড়াকামড়ি কচ্ছে। মৃতদেহ পোড়াবার কেউ নেই...''

নাট্যকার ওই সময় ছিলেন শহর কোলকাতায়। পালাকার সেই সময়ে ছিলেন কার্তিকপুরে—গ্রামে। সেখানে লঙ্গরখানা খুলে তাঁর যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা তিনি 'মহাযুদ্ধের বলি' নাটকে তুলে ধরেছিলেন।

গ্রামীণ লঙ্গরখানাকে কেন্দ্র করে যা যা ঘটেছিল, সেইসব ছিল ঃ

১। একজন গ্রামবাসীর বক্তব্য — ''কই, আমার ত নেমন্তন্ন হয়নি।...সাধাসাধি না করলে কিন্তু আমি খাব না...''

২। জনৈক ব্রাহ্মণ — ''হিন্দু -মুসলমান সব একাকার। এক জায়গায় বসা হচ্ছে, একসঙ্গে দেওয়া হচ্ছে, বামুন বাগ্‌দী মুসলমান চাঁড়ালে ছোঁয়া-ছুঁয়ি কাণ্ড।''

৩। বৈষ্ণব বাবাজী — ''খিচুড়ি খাওয়ালে, কিন্তু ভোজন - দক্ষিণে দিলে না।...নইলে তাদের পুণ্যি হবে কেন?''

৪। জনৈক চাষা — ''আমার টিকিট কেড়ে নিলে। ... কালকে এই টুকুন খিচুড়ি পেয়েছি।''

৫। পাশাপাশি ছিল এক বৃদ্ধের কিশোর ছেলের না খেতে পেয়ে অকালমৃত্যু।

পালাকারের বিখ্যাত পালা রাজনন্দিনীর' ভূমিকাতেও ছিল তাঁর ওই অভিজ্ঞতার ছাপ ঃ

''পঞ্চাশের মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ বাঙালী যখন অন্নাভাবে মরিতে ছিল, ... সেই সময়ে এক ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছিলেন —আমি মরবো, তবু লঙ্গরখানায় গিয়ে ছোটলোকের ছোঁয়া খিচুড়ি খাবো না। তারপর অর্ধাহারে তিনি সত্যই প্রাণত্যাগ করেন, তবু ছোটলোকের ছোঁয়া খাদ্য তাঁহাকে খাওয়ানো যায় নাই।''

বিজন ভট্টাচার্য যাদের কোলকাতার ফুটপাতে দেখেছিলেন, তাদেরই একাংশ গ্রামেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাদের দেখেছিলেন পালাকার। কাজেই দুজনকে একসঙ্গে নিলে সম্ভবত গোটা বাংলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে।

দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে পালাকার অনেকটাই নির্মোহ হতে পেরেছিলেন। কারণ মানবতাবাদী হলেও তাঁর ঘাড়ের ওপর সব সময়ে দলের নিঃশ্বাস পড়েনি। (তবে কম্যুনিস্টদের সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন যে, তার প্রমাণ 'মহাযুদ্ধের বলি'র পরিত্যক্ত অংশে ছিল ''কম্যুনিস্টগণ নিশান লইয়া গান গাইতে গাইতে চলিতেছিল।''

'মহাযুদ্ধের বলি' নাটকে এক সভায় পালাকার নিরক্ষর চাষী আকবরের মুখে বসিয়েছিলেন একটি ভরতবাক্য — ''অহন দ্যাশের মইধ্যে আর ইন্দু মোছলমান নাই, অহন আছে দুইডা জাত—বেচাইয়া আর খাওইয়া; লুভী মহাজন আর গাহেক।'' এর পরেই পল্লীমঙ্গল সমিতির সভাপতি বলেন, — ''দেশের দুঃখ দুর্দশা স্থায়ীভাবে দূর করতে হলে, আমাদের গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা চাই। ... আমাদের গভর্ণমেন্টের জন্য প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করতে হলে রাজনৈতিক ঐক্য একান্ত আবশ্যিক।

সেই সময়ে পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করে সভা ভেঙে দেয়।

মজুতদার তার মজুত করা শস্য আর কেরসিন তেল নিয়ে কিভাবে কালোবাজারি চালাচ্ছিল তাও ছিল এক দৃশ্যে। সেখানে মহাজন আশী টাকা দরে সন্ধ্যের অন্ধকারে চাল বিক্রী করে।

এর সামান্য পরে লুম্পেন একদল সাধারণ মানুষ চাল লুট করবার পরামর্শ দেয়। সেখানেও কিন্তু পালাকার সচেতনতা নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন ঃ

করিম।। সবাই যদি সবার সম্পত্তি লুঠ করে, দেশটা যে আরও রসাতলে যাবে।

মহাযুদ্ধের বলি পালাকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল ছিল। তাই লুম্পেনের চরিত্র যথাযথ চিত্রিত হয়েছিল ঃ ''লুঠ হলে বরখা নেন, দারোগার সঙ্গে গাধাবোটের মতো চলেন। আজ আবার চাষী পাড়ায় এসেছেন বোধহয় ধান গাপ করার মতলবে।''

মজুতদারেরাও কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তাও তিনি সোজাসুজি বলেছিলেন একটি সংলাপে— ''এদের সৃষ্টি করেছে এই শয়তান স্বৈরাচারী শাসকের দল।'' সেখানেই তাঁর স্বাধীন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল — ''মনুষ্যত্বের এতোবড়ো দুশমনকে আর আমরা গদীতে বসে থাকতে দেব না।''

এর পরিণাম অবশ্য, অচিরেই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। কার্তিকপুর, এমন কি পূর্ববঙ্গ ছেড়ে তাঁকে চলে আসতে হয়েছিল এই বঙ্গে।

বহমান মানবিকতা ঃ

ম্যূলবোধের ক্ষয় হয়, অবলুপ্তি ঘটে — বন্যা, মন্বন্তর, মহামারীর সময়ে— এটা মিথ্যে নয়। বিজন ভট্টচার্য তা দেখেছিলেন, ব্রজেন্দ্রকুমার দে তা বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই হতাশ হননি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ওই বালির নীচে ফল্গু নদীর মতোই মানবিকতার স্রোত রয়ে গেছে।

নবান্ন নাটকে নিরঞ্জনের স্ত্রী বিনোদিনী শহরে এসে ভিক্ষে করে ফিরে এসে দেখে তার স্বজনেরা কোথায় চলে গেছে। অচেনা শহরে স্বজনহীন বিনোদিনী যখন নিরুপায় হয়ে আর্তনাদ করে উঠে ''হায় হায় হায় হায়, কি করি এখন আমি' বলে, তখনই টাউট তাকে আশ্রয় আর নিশ্চিন্ত আহারের টোপ ফেলে নিয়ে যায়। দরিদ্র চাষী চন্দর তার মেয়েকে বিক্রী করে ফেলে। চন্দরের অভাবের সুযোগ নেয় দুর্জন হারু দত্ত, কিন্তু মেয়েকে বিক্রী করেই কান্নায় ভেঙে পড়ে চন্দ্র। বিনোদিনীর দয়িত নিরঞ্জন সেবাশ্রমে আটক বিনোদিনীকে দেখে তাকে উদ্ধার করবার জন্য সক্রিয় হয়। ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া খাবার তুলতে গিয়ে কুঞ্জ কুকুরের কামড়ে আহত হয়। তার স্ত্রী রাধিকা তখন পরম মমতায় তার হাত বেঁধে দেয় নিজের কাপড় ছিঁড়ে। অন্নাভাবের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্যই বস্ত্রাভাবও ছিল। কিন্তু যুবতী রাধিকার নিজের (সম্ভবত একমাত্র সম্বল) শাড়ী ছিঁড়তে দ্বিধা হয়নি। এই দৃশ্যটিতে বিজন ভট্টাচার্য সংলাপ কমিয়ে চিত্রকল্প নিয়ে এসে ভালবাসা তথা মানবিকতার একটি মহান দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন ঃ ''গভীর মমতায় রাধিকা শুধু কুঞ্জর কপালের ওপর থেকে বিস্রস্ত চুলগুলো সরিয়ে দেয়। হঠাৎ কেঁদে ফেলে। কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে, তারপর বাঁ হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর।''

রাধিকার সমবেদনা আর আহত কুঞ্জর বেদনার্ত রাধিকাকে সান্ত্বনা দেবার এই প্রয়াস দু-চার পৃষ্ঠা সংলাপের চেয়েও অনেক বেশি গভীরে প্রবেশ করে।

আর যাঁরা বিজন ভট্টাচার্যকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য না বলবার জন্য অভিযুক্ত করেন তাঁরা সম্ভবত তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যটিকে ভুলে যান। চিকিৎসা কেন্দ্রের ওই দৃশ্যটিতে প্রথম দিকে দেখা যায় রোগীর ''এটুখানি ভাল ওষুধ দিন'' অনুনয়ের উত্তরে বিরক্ত ডাক্তার বলে, ''ভালো ওষুধ কি আমি গড়াব?'' দৃশ্যের শেষে বোঝা যায় ডাক্তারের বিরক্তি রোগীদের ওপর নয়, প্রশাসনের প্রতি, ''দি ফিউচার ইজ বিয়িং মার্ডার্ড, ডেলিবারেটলি মার্ডার্ড''। ডাক্তার পরে যখন বলে 'থিভস্'', তখন কারা সেই ''থিভস'' তাতে কোনো সন্দেহই থাকে না।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর 'আকালের দেশ' পালায় মানবিকতার দুটি বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথমটি বিদ্রোহী কৃষকদের নেতা জনার্দনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল। জনার্দনের স্ত্রী লক্ষ্মীকে অপহরণ করেছিল দুর্জন শাসক সুকণ্ঠ। একসময়ে রাস্তায় ওই সুকণ্ঠের স্ত্রী বাণীকে সঙ্গীহীন অবস্থায় পেয়েছিল জনার্দন। সঙ্গী আর এক কৃষক নেতা জনার্দন বলেছিল, ''সে যেমন আমাদের বৌয়ের মাথায় কলংকের ডালি তুলে দিয়েছে— আমরাও তেমনি তোমার মাথায় কলংকের পশরা তুলে দেবো।'' জনার্দন কিন্তু বাণীকে বলেছিল, ''ভয় কি? আমি ভাই।'' উচ্চবর্ণের ধনী সুকণ্ঠ উপকারী জনার্দনের করেছিল চরম অপকার। অন্যদিকে জনার্দন অপকারী সুকণ্ঠের স্ত্রীর মর্যাদাহানি করেনি। অন্নাভাব ও অত্যাচারেও জনার্দনের মানবিকতা লোপ পায়নি।

অত্যন্ত সাধারণ এক প্রজা মাতঙ্গ অন্ন্যাভাব ও নির্যাতনের আশংকায় দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিল। তখন তার স্ত্রী হারিয়ে গিয়েছিল। সে সুযোগ পেয়েও অন্য কাউকে বিয়ে করেনি। পালার শেষে তার স্ত্রী ফিরে এলে সে তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করেছিল।

মাতঙ্গ ।। বউ এসেছে...

সুকণ্ঠ ।। তোমার স্ত্রী? কোথায় ছিল?

মাতঙ্গ ।। সে কথা তো জিজ্ঞেস করিনি। তার ধর্ম তার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে।

সুকণ্ঠ ।। সে যদি কলংকিনী হয়?

মাতঙ্গ ।। সে তো তার দোষ নয়।

Oscar Wilde বলেছিলেন —''The artist is the creator of beautiful things.'' ব্রজেন্দ্রকুমার দুর্যোগের ঘনঘটার মধ্যেও মাতঙ্গ আর জনার্দনের আচরণে মানবিকতার রূপোলি রেখা এঁকেছিলেন। এটা অবশ্যই তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। যেমন বিজন ভট্টাচার্য রাধিকা - কুঞ্জ, বিনোদিনী - নিরঞ্জনের মধ্যে মানবতার সুগন্ধি গোলাপ ফুটিয়েছিলেন অভাবের পাঁকের মধ্যেও।

শিক্ষা ঃ

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য মনে করতেন, বিশ্বাস করতেন পালাকার ব্রজেন্দ্র কুমার দেও যে, শিক্ষার জন্য পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। মন্বন্তর এবং তার কুফল সে জন্যই নাট্যকার তিন - তিনবার এনেছিলেন নিজের রচনায়। নানা দিক থেকে দেখতে চেয়েছিলেন, দেখাতে চেয়েছিলেন ওই মর্মন্তুদ ঘটনাকে। ব্রজেন্দ্রকুমারও 'আকালের দেশ', 'মহাযুদ্ধের বলি'র পরে 'উজানীর চর', 'স্বামীর ঘর', 'যাদের দেখে না কেউ', এমনকি 'নন্দকুমারের ফাঁসি' পালাতেও তুলে ধরেছিলেন ওই অন্যায়কে। 'মায়ের ডাক' ও 'ধরার দেবতা' পালায় ও দুর্ভিক্ষকে শাসককুলের পরিকল্পিত genocide বলেছিলেন তিনি।

সেইসঙ্গে শিক্ষাও দিতে চেয়েছিলেন ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষকে। প্রতিবাদে কঠোর হতে বসেছিলেন তাঁরা। 'আগুন' -এর শেষে জনৈক পুরুষ বলেছিল, — ''বাঁচতে হলে মিলেমিশে থাকতে হবে।'' জবানবন্দীর সমাপ্তি পরাণের ''তোরা সব ঘর ফিরে যা'' নির্দেশে। আর নবান্নের শেষে শুরু হয় প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চাষীদের নতুন জীবন।

ব্রজেন্দ্রকুমারের 'অকালের দেশে' মন্বন্তরক্লিষ্ট রাষ্ট্রে কায়েম হয় কৃষকদের আধিপত্য। 'মহাযুদ্ধের বলি'তে ভারতীয় জনতার নিজস্ব ''গভর্ণমেন্ট'' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি থাকে। 'স্বামীর ঘর' -এ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হয় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী শোষক।

বিজন ভট্টাচার্য যখন নাটক লিখেছিলেন, তখন মঞ্চে সামাজিক নাটকের প্রচলন হয়ে গেছে। তিনি ওই সামাজিক নাটককে

ইতিহাস ও পুরাণোর মোহময় আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। নবান্ন সেই দিক থেকে বাংলা নাট্যধারা নতুন পথে যাত্রা শুরু করবার প্রাথমিক প্রয়াস।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে যখন পেশাদার যাত্রার পালা লেখা শুরু করেছিলেন, তখন স্বদেশী যাত্রায় মুকুন্দ দাসের সাফল্য সত্বেও পেশাদার যাত্রায় সামাজিক পালা অপ্রচলিত ছিল। সমকালের মানুষের দুঃখ বেদনা সুখ আশা — সব মিলিয়ে উপস্থাপিত হয়েছিল 'আকালের দেশ' পালায়। 'আকালের দেশ' যাত্রাপালাকে নতুন আঙিনায় নিয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তী প্রজন্মের পালাকারদেরও প্রভাবিত করেছিল বহুদিন পর্যন্ত। ব্রজেন্দ্র - পরবর্তী যুগের জনপ্রিয় পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন— ''অকালের দেশ। ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র লেখা পালা। আমার জীবনে নতুন এক অধ্যায় শুরু হলো। ওই পালা দেখামাত্রই উপলব্ধি করলাম। অভিভূত হয়ে— পড়লাম। কত সহজভাবে গ্রাম্য সমস্যা পালায় তুলে ধরা যায়। আমিও অনুপ্রাণিত হলাম।''

অন্যদিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নবান্ন দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, ''হঠাৎ মনে হলো, আমাদের বুক দশহাত হয়ে গেছে। ...আমাদের গান - নাটক আর লেখা নিয়ে যারা মুখ টিপে হাসত, তাদের সামনে এবার আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। ...নাটকের সংলাপ একবার শুনলে আর ভোলা যায় না।''

মিথ্যে নয়, পুরোপুরি সত্য। নবান্নের গান, ''শক্ত করে ধর হাল হালে পাবে পানি'' আর অকালের দেশে ''ওরে ধনীর ভগবান, ভাবনা শুধু ওদের তরে মোদের ধড়ে না থাক প্রাণ'' ...দশকের পর দশক ধরে গ্রামের সাধারণ মানুষ আর শহর - মফস্বলের খেটে খাওয়া জন গেয়েছে। বহুনাটক, বহু পালা মানুষ দেখেছে আর তার স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছে। এই নাটক, এই পালা যে দেখেছে, সে আর ভুলতে পারেনি। তার কারণ এইসব নাটক আর পালা লেখকদের ছিল না, ছিল সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষের কান্না এই দুই লেখকের চোখে আগুন হয়ে প্রতিভাত হয়েছিল।

শ্রমিক ঃ

'অবরোধ' নাটিকাটি বিজন ভট্টাচার্যের সরাসরি শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে লেখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলন দানা বাঁধছিল বামপন্থীদের কেন্দ্র করে। তৎকালীন বামপন্থী শ্রমিকদের আপসহীন মনোভাব ও কার্যধারা স্বাধীন ভারতের গোড়াতেই বিজন ভট্টাচার্য উপলব্ধি করেছিলেন। 'অবরোধ' তারই ফসল। এখানে মালিক পক্ষকে এবং যথার্থ শ্রমিক নেতাকে স্বচ্ছন্দে চিনে নেওয়া যায়। সেটা সম্ভব হয়েছিল নাট্যকার কমুনিস্ট পার্টির একজন ছিলেন বলে।

ব্রজেন্দ্রকুমার কখনও কম্যুনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে ছিলেন না। কিন্তু জীবনের দ্বিতীয়ার্ধ শিল্পাঞ্চলে কাটাবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রচনায় শ্রমিক আন্দোলনের ছাপ এসেছিল। 'ওভার টাইম' নাটকে তিনি বেশি মজুরির টোপ ফেলে শ্রমিকদের দিন আট ঘন্টারও বেশি কাজ করাবার সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এর ফলে শ্রমিকদের শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক অবনমন ঘটবার সম্ভাবনা আছে। সেইসঙ্গে তিনি শ্রমিক পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ইঙ্গিতও রেখেছিলেন। এই নাটকের মালিক কিন্তু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ছিল না, ছিল রাষ্ট্র। শ্রমিকের ছেলেদের বিপথে নিয়ে যাবার জন্য পালাকার সরাসরি ওই সময়কার উগ্র দক্ষিণ, দক্ষিণ ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকেই দায়ী করেছিলেন।

তাঁর 'ফুলিশ' নাটকটিকে তিনি নিজেই বাতিল করে গেছেন। কিন্তু 'আঁখি মেলো' (অমাবস্যার রাত নামে প্রকাশিত) নাটকে সুবিধাবাদী মেকি শ্রমিক নেতার পাশাপাশি সৎ ও দরদি এবং বিবেচক শ্রমিককে তিনি দেখিয়েছিলেন। তবে এ বিষেয়ে তাঁর সবচেয়ে সাহসী রচনা জবাব চাই। অনভিনীত ও অপ্রকাশিত এ পালায় মালিপক্ষকেই কারখানার সম্পত্তির ক্ষতি করে দায় সংগ্রামী শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে মালিক পুলিশ এবং বশংবদ শ্রমিক নেতারও সহায়তা নেয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, বিজন ভট্টাচার্যের অবরোধ রচিত হয়েছিল প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে। ব্রজেন্দ্র কুমার 'ওভার টাইম', 'অমাবস্যার রাত', 'জবাব চাই' -এর রচনাকাল ১৯৭০ বা তার সামান্য পরে। সুতরাং এই বিষয়ের কাহিনিতে ও বিজন - ব্রজেন্দ্র বিশেষ তফাৎ লক্ষিত হয়। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা আরও প্রকট হয়।

পদস্খলিত নারী ঃ

হাঁসখালির হাঁস নাটকে যুবতী মেয়ে পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য দেহ ব্যবসায় নামে। অন্যায় হলেও সে অন্যায়ের দায় যুবতীর নয়, নয় তাকে ওই কাজে যোগদানে বাধা না দেওয়ার জন্য তার মার, দায় সমাজে অব্যবস্থার —এই ছিল নাট্যকারের বক্তব্য। পতিতাবৃত্তি অন্যায়, কিন্তু একটি মেয়েকে পতিতা বানায় যে পরিস্থিতি তার স্রষ্টারাই আসলে দোষী। হাঁসখালির হাঁস পাঠের পরে পাঠকের এ বিষেয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। (যতদূর জানি হাঁসখালির হাঁস নাট্যকার রিহার্সাল দিয়ে মঞ্চস্থ করে যেতে পারেন নি)।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে অবশ্য তাঁর পতিতা নিয়ে লেখা তিনটি পালারই সাফল্য দেখেছিলেন। 'বিল্বমঙ্গল' পালার চিন্তামণি সমাজের অবিচারেই বিল্বমঙ্গলের রক্ষিতা হতে বাধ্য হয়েছিল। শেষ আরতি পালার উর্বশী অন্তঃসত্তা অবস্থায় অপহৃত এবং পাশবিক অত্যাচারের শিকার হবার পরে বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তি বেছে নেয়। বিনোদিনীর জন্ম পঙ্কে হলেও ওই জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চান তিনি। কিন্তু ''ভদ্রজন'' দের মুখপাত্র গিরিশচন্দ্রের চাপে পড়ে তাঁকে 'নরদানব' গুর্মুখ রায়ের প্রস্তাবে রাজি হতে হয়। স্পষ্ট বোঝা যায় ব্রজেন্দ্রকুমারের সহানুভুতির চরিত্র ওই উর্বশী, চিন্তামণি, বিনোদিনীরা তথা সমাজের ঘৃণিতা, উপেক্ষিতারা।

নিজেদের দেখা ঃ

অনেক স্রষ্টাই নিজের চরিত্রের ছাপ রেখে যান সৃষ্টির মধ্যে। যে নাটকের অভিনয় শেষ করে বাংলা নাটকের নবযুগের ভগীরথ বিজন ভট্টাচার্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ছিলেন, সেই মরাচাঁদের পবন অবশ্যই কিছু পরিমাণে নাট্যকারের প্রতিনিধি। হার - না - মানা, দারিদ্র আর অবিচারকে গ্রাহ্য না করা এবং দুঃসহ বেদনাতেও আদর্শে অবিচল থাকা— পবনের এই মানসিকতা অবশ্যই তার স্রষ্টার প্রতিফলন।

এইভাবে সীতার বনবাসের বাল্মীকি যখন জানায় যে, বর্তমানের পরিবারের কাহিনি ভবিষ্যতে পৌঁছে দিলে ওই প্রজন্ম সমাধানসূত্র খুঁজে বার করতে পারে, তখন ''পুরস্কার তিরস্কার কলঙ্কে কণ্ঠের হার' করে ফেলা পালাকারকে চিনে নিতে কারও ভুল হয় না। আর যাত্রা নিয়ে লেখা পালা 'ঝড়ের খেয়া'র নির্মোহ দধীচি নীলকণ্ঠ যে তিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রকুমার এও বুঝে ফেলত অসুবিধে হয় না।

উহসংহার

বিজন ভট্টাচার্য কম্যুনিস্ট ছিলেন। ফলে সংগ্রামের মানসিকতা তাঁর মধ্যে থাকাই স্বাভাবিক ছিল। ব্রজেন্দ্রকুমার দে ছিলেন মানবতাবাদী। কিন্তু তিনিও জানতেন উত্তরণের সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করলে পরাজিতদের গ্লানির অংশভাগী হতে হয়। এও তিনি জানতেন যে, সংগ্রামের সময়ে নিরপেক্ষ থাকলে মানবতার শত্রুদেরই হাত শক্ত করা হয়।

চিনে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে— একটা মন্দ বস্তুকে সুন্দর করে তোলা যায়। বিজন ভট্টাচার্য মন্বন্তরের কালোছায়া, শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা, নারীর পদস্খলন—সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করে শুভ লক্ষ্যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ফলে ওই ''কৃষ্ণপক্ষ'' তাঁর

নাটকে শ্বেত চন্দনে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে ব্রজেন্দ্র কুমার অবজ্ঞাত, ঘৃণিত, অবহেলিত যাত্রার আঙিনায় একেবারে সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের দুঃখ — বেদনার উৎস পরিবেশ করেছিলেন। ফলে দর্শক ওই অবিচারের মূলোচ্ছেদ করবার লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিল।

বিজন ভট্টাচার্য চাইলে আত্মবিক্রয় করে খ্যাতি - অর্থ - পুরস্কার লাভ করতে পারতেন। ওই পথে পা রাখবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেননি। ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রার আঙিনায় আদৌ পা না রেখে প্রাচুর্যের স্বাদ পেতে পারতেন। কিন্তু সে চিন্তাও তিনি স্থান দেননি মনে। দুজনেই জানতেন, কেউ কেউ জীবন উৎসর্গ না করলে পৃথিবী এগোতে পারে না।

বিজন ভট্টাচার্য বলেছিলেন —''রোগী হবার দুর্ভাগ্য ছিল, ডাক্তার হবার যোগ্যতা ছিল না।'' এখানে গণনাট্যের অন্যতম স্রষ্টা সবিনয়ে নিজেকে জনগণের একজন বলে চিহ্নিত করেছিল। এটা বিনয় ছিল না, ছিল নিজের শ্রেণিগত অবস্থানকে নিরুপণ করা। তিনি এই বলেছিলেন – ''কিন্তু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিল এবং তার ফলাফল আজও সুদূরপ্রসারী।'' এই দাবি অযৌক্তিক কেউই তা বলবেন না। কিন্তু নাট্যকার এর সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলেন– ''সুসংবদ্ধ, সংহত হবার অপেক্ষায় নাট্য আন্দোলনের প্রগতি।'' অথাৎ ক্রমাগত এগিয়ে চলাকেই তিনি স্বাগত জানিয়ে ছিলেন।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যন্ত্রণা ছিল আরও বেশি তাঁর সংগ্রামের সঙ্গী ছিলেন সংখ্যায় আরও কম এবং তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছরে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি যে বামপন্থীদের সহায়তা তিনি পাবার আশা করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন। আক্ষেপ ঝরে পড়েছিল খাঁটি যাত্রাকারদের পদস্খলনেও, —''আমাদের দু একজন সহযোগির উপর বিষাক্ত প্রভাব পড়েছে।... যাত্রার যথার্থ ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন এঁরাই বেশি ধিক্কৃত হবেন।''

বিজন ভট্টাচার্য প্রয়াণের সামান্য আগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন — 'রবীন্দ্র সদন রিহার্সালের জন্য একটা ঘর দিয়েছিলেন, আবার বের করে দিয়েছেন। এখন পথে। এই আমার শেষ পুরস্কার।'' পাঠক জানেন কি না জানিনা, হাঁসখালির হাঁস (সপ্তাহ পত্রিকায় প্রকাশিত নাটক) তিনি মঞ্চস্থ করে যেতে পারেননি। তাতে মেট্রোরেলের কাজ-কারবার নিয়ে কটাক্ষ ছিল। ওই সময়েই প্রগতিশীল নাটকের উৎসব হয়েছিল রবীন্দ্র সদনে। বাদ পড়েছিল কবচকুণ্ডল অর্থাৎ বিজন ভট্টাচার্য ও তাঁর নাট্যদল। অবশ্য অভিনয় পত্রিকার বক্তব্য ছিল— ''Drama Selection Committee''তে যাঁরা ছিলেন, তাদের অধিকাংশই বিজনদার একান্ত ঘনিষ্ঠ লোক এবং বিভিন্নভাবে তাঁর কাছে তাঁরা উপকৃত।'' দূরদর্শনে বিজন ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিল তবে তা নষ্ট হয়ে গেছে। আকাশবাণী তার সাক্ষাৎকার প্রচারের কথা আদৌ ভাবেনি। কারণ তিনি ''ঝাণ্ডা ''does not determine man's life'' -এ বিশ্বাসী ছিলেন। এটাও বলেছিলেন যে, নাটকের মাধ্যমে পয়সা উপার্জনটাই আদি ও অকৃত্রিম উদ্দেশ্যে পরিণত করবার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। এও স্বীকার করেছিলেন— যে চিন্তা ও আদর্শ নিয়ে গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল, বিশ শতাব্দীর শেষ পর্বের পেশাদারি আওতার সে লক্ষে স্থির থাকা সম্ভব হয়নি।

ব্রজেন্দ্রকুমারের প্রথম জীবনের পরীক্ষামূলক পালা 'চাঁদের মেয়ে' চারটি যাত্রাদল বাতিল করেছিল। তাঁর সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পালা, 'বাঙালী' তাঁর সবচেয়ে বেশি পালার প্রযোজক দল অভিনয় করেনি। তাঁর অন্যান্য অনেক বিখ্যাত পালাই তাঁর ভাষায় ''দূর ছাই'' বলে যাত্রাদল ফেরৎ দিয়েছিল। এমন কি, শেষ জীবনে লেখা তাঁর বক্তব্য ও আঙ্গিকের পরীক্ষামূলক অনেকগুলো পালাই '(জবাব চাই', 'নদে ভেসে যায়', 'অনাথ জননী', 'ঝড়ের খেয়া', 'সম্রাট দুর্যোধন', 'অশ্রু - রক্ত - কবর') কোনো যাত্রাদলই অভিনয় করেনি। এমনকি, যে সব যাত্রাদলের জন্য তিনি পালা লিখতেন তাদের অনেকেই অশ্লীল অনাটক পরিবেশনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁর জীবদ্দশাতেই।

না, আকাশবাণী বা দূরদর্শনে তাঁর কোনো সাক্ষাৎ প্রচারিত হয়নি। কারণ ওই একই। তিনি মন জুগিয়ে কথা বলতে বা কাজ করতে পারতেন না। মজার কথা এই যে, ১৯৭৩ - এর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাত্রা উৎসবে তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বা পালাকারের পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হননি, যদিও ওই প্রতিযোগিতাতেই তাঁর নটী বিনোদিনী অভিনীত হয়েছিল। ওই প্রতিযোগিতার উপদেষ্টা ছিলেন অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তিনিও। পরে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— ''পরামর্শদাতা কমিটি সাধ্যমত পরামর্শ দিয়েছেন ; সে পরামর্শ সবটা গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য ছিলেন না, এবং তা করাও হয়নি।'' পরের প্রতিযোগিতা (১৯৭৫)-র আগেই তিনি উপদেষ্টা হবার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন। ১৯৭৫ -এ অভিনয় পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে ওই সময়ের যাত্রা সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ জানালে তিনি প্রথমেই বলেছিলেন — ''বলতে আমার লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে।'' যাত্রায় অশালীন দৃশ্য পরিবেশন বা অশ্লীল সংলাপের প্রয়োগ এবং জীবন - বিমুখ পালা উপস্থাপনের ব্যাপারেই ছিল তাঁর ওই প্রতিক্রিয়া।

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য বলেছিলেন— ''পুকুরের জলে কি আর নদীর কুলকুলধ্বনি শোনা যায়?'' পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে লিখেছিলেন, —''কুমুদ কহলারের সৌন্দর্য দীঘির বুকেই দেখতে হবে— তেতলার ছাদের উপরে টবে ফুটিয়ে দেখলে চলবে না।'' গণের নাটক, গণের যাত্রা — গণের ভাষা, গণের চিন্তা, গণের বেদনা - আনন্দ নিয়েই গড়ে উঠুক — এটাই তাঁরা চেয়েছিলেন। দুজনের কেউই শহুরে হতে চাননি। আর এটাই বোধহয় তাঁদের ব্রাত্য করে রাখবার অন্যতম প্রধান কারণ। বিজন ভট্টাচার্য প্রথম জীবনেই পার্টির ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে মাথা উঁচু করে চলেছিলেন আমৃত্যু। অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রকুমার ১৯৭০ -এর কাল থেকে অযাত্রার বিরোধিতা করে শত্রু বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। 'নটী বিনোদিনী', বিদ্রোহী নজরুলের জনপ্রিয়তা সত্বেও তাঁর সম্পর্কে নীরবতা পালনের একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। বিশেষত তাঁর সঙ্গে গ্রুপ থিয়েটার তথা অভিনয় পত্রিকার ঘনিষ্ঠতা যাত্রাজগতের সুনজরে ছিল না।

'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকে বিজন ভট্টাচার্য একটি চরিত্রে অভিনয় করবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু ওই প্রযোজনার কমার্শিয়াল ম্যানেজার তাঁকে ''নিদারুণ অপমান'' করে চোখের জল ফেলতে বাধ্য করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রকুমার অভিনয় করতেন না। তাই ওই জাতীয় অসম্মান তাঁকে বরণ করতে হয়নি।

ব্রজেন্দ্রকুমার আর এক দিক থেকে ভাগ্যবান। তাঁকে বুদ্ধিজীবি বামপন্থী মহল আলোচনার যোগ্য বলে মনে করেননি। ফলে ভুল ব্যাখ্যার কায়দায় তিনি ভূষিত হননি। অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বামপন্থী পত্রিকা লেখে— ''এত সৃজনীশক্তি এবং প্রতিভার অধিকারী হয়েও শেষ পর্যন্ত হতাশার যুপকাষ্ঠে বলি হয়ে গেলেন''।

পথিকৃৎ পত্রিকা বলেছিল — ''এভাবে কোনো বড়ো মানুষকেই শেষ পর্যন্ত ছোটো করা যায় না; তাতে বড়ো মানুষের কোনো এসে যায় না।'' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বলা হলেও এই বক্তব্য বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে।

১৯৭১ -এর কোনো এক সময়ে অম্বিকা নাট্য কোম্পানি বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবী গর্জন' অভিনয় করবে জানিয়ে যুগান্তর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত 'দেবী গর্জন' পালায়িত হয়নি। কিন্তু ওই সংবাদে ব্রজেন্দ্রকুমার দে খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। সেই সময়ে প্রায় নিঃসঙ্গ ব্রজেন্দ্রকুমার শান্তিগোপাল ও শম্ভু বাগের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বিজন ভট্টাচার্য এলে তিনি আর একজন সঙ্গী পাবেন— এই চিন্তাই তাঁকে আনন্দিত করেছিল। যদি হতো, তাহলে বিজন - ব্রজেন সম্মিলিত হয়ে অবশ্যই রাশিকৃত ধূলোর মধ্য থেকে মুক্তোর দানা খুঁজে বার করতেন। হয়নি, আমাদের পরিতাপের বিষয়।